গুপ্ত-চক্রান্ত

শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত

প্রকাশক—ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—[illegible] টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ

ফাইন আর্ট প্রেস ৬০, বিডন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরাধারমণ দাস
কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গুপ্ত-চক্রান্ত

এক

সাম্‌না-সামনি আক্রমণ করলে শত্রু যতই পরাক্রমশালী হোক তার সঙ্গে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও যোঝা যায় এবং হয়ত আত্মরক্ষার উপায়ও নির্ণয় করা সম্ভব হয়, কিন্তু পিছন দিক থেকে সহসা আক্রান্ত হ'লে বিপদের আর অন্ত থাকে না। হঠাৎ একদিন আমার ভাগ্যেও সেই রকম বিপদ ঘনিয়ে উঠেছিল। অতি অল্পের জন্যই সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলাম।

বারাকপুর ষ্টেশনের ধারে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় এক ভীমকায় হিংস্র গুণ্ডা আমার অজ্ঞাতে পিছন থেকে আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অমানুষিক জোরে আমার গলা টিপে ধরল।......

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই অসাড় বিহ্বল হ'য়ে গেলাম।... দম আটকে আসতে লাগল।...মনে হচ্ছিল, এখুনি দম বন্ধ হয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

আমার সঙ্গিনী মেয়েটিই আমাকে সেই বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। মেয়েটির নাম ললিতা।

কিন্তু তার কথা বলবার পূর্ব্বে নিজের পরিচয় দিয়ে গোড়ার কথাগুলো আগেই বলে নি।

আমার নাম বিজয় গুপ্ত। নিবাস, কলিকাতা। বয়স ত্রিশ। পেশা, এক সাহেব বন্ধুর সঙ্গে আমদানী-রপ্তানির ব্যবসা।

একদিন সন্ধ্যার সময় বালিগঞ্জ থেকে ফিরছিলাম। সেই দিনই আমার জীবনের এই রোমাঞ্চকর ঘটনার সূত্রপাত।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি। কয়েকদিন হ'ল অকালে বর্ষা নেমেছে। সন্ধ্যার পূর্ব্ব থেকেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। চারিদিকে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠেছে, রাস্তায় বেরুলে মানুষকে ঠাওর ক'রে পথ চলতে হয়, চারিদিক এমনি তমসাচ্ছন্ন। এমনি দিনে বন্ধুর বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ সেরে ট্রাম ধরবার জন্য ধীরে ধীরে ডিপোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হ'য়েছি এমন সময় আমার পাশে এসে একখানি মোটর দাঁড়াল, ঠিক যে দাঁড়াল তা নয়, আমার পাশে এসে গতি মৃদু ক'রে দিল এবং তার ভিতর থেকে একজন প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক মুখ বার ক'রে আমার দিকে কিছুক্ষণের জন্য চেয়ে রইলেন।

মিনিট কয়েক মাত্র। পরক্ষণেই আরোহীর আদেশে মোটর চালক গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলে এবং নিমেষ মধ্যে মোটর সম্মুখের এক গলির মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বিস্মিত হলাম। কে এই ভদ্রলোকটি? কেনই বা

তিনি অমন করে আমার পানে তাকালেন ? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, এতে এত বিস্ময়েরই বা কি আছে ! হয়ত ভদ্রলোক আমাকে তাঁর কোন পরিচিত ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন তাই মুখ বাড়িয়ে ব্যগ্র হ'য়ে আমাকে দেখছিলেন। অন্ধকারে এমনতর ভুল করা আশ্চর্য্য নয়।

* * * *

অদূরে ট্রাম ডিপোর পিছনে ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। নির্জ্জন পথ। জনমানবের সাড়া নেই। কুয়াসার জাল ভেদ ক'রে বেশীদূর সম্মুখের পানে দৃষ্টি চলে না। পা চালিয়ে অগ্রসর হলাম।

ও কি ও! কাঁদে কে!··

সহসা আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। এমন সময় পথের উপর দাঁড়িয়ে অমন ক'রে কাঁদে কে? ভাল ক'রে চেয়ে দেখি, কয়েক হাত তফাতে গ্যাস-পোষ্টের তলায় একটি বছর দশেকের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, এবং দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দুই একটি প্রশ্ন ক'রেই বুঝলাম, ছেলেটি পথ হারিয়েছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্লে—আমার নাম খোকা।

—খোকা। বেশ নাম। ভালো-নাম কী বল ?

—সুকুমার রায়।

—তোমার বাবার নাম কি ?

বালকটি এইবার চোখ তুলে আমার পানে চাইলে।

বল্লে— বাপের নাম? তাতো জানি না। মামার নাম জানি। শ্রীযুক্ত জগদীশ সেন। আমি মামার কাছেই থাকি।

বল্লাম—ভালো কথা, তাহ'লে চল তোমাকে মামার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। কোন্ রাস্তা দিয়ে এসেছিলে?

—এই রাস্তা দিয়ে; ব'লে বালক পিছনের একটি সরু পথ দেখিয়ে দিলে। তারপর বল্‌লে—আমাদের বাড়ী যে রাস্তায় সে রাস্তার নাম আমি জানি। নম্বরও জানি। মামা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

সুকুমার একটি রাস্তা এবং নম্বরের নাম করলে।

বল্‌লাম—তবে আর কি! চল, যাওয়া যাক। কেমন ক'রে পথ হারালে? একলা বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে বুঝি?

—না, না, একলা কেন বেরুব, বদনের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। পার্কে এসে বেড়াচ্ছি, বদন বল্‌লে, দাদাবাবু, তুমি এখানে বোসো, আমি এখনি আস্‌ছি। বদন কে জানেন? আমাদের বাড়ীর চাকর। ভারী বোকা। আমাকে বসিয়ে রেখে চলে গেল, আর আসেই না। আমিও লোকের পিছু পিছু উঠে এলুম। আজ বাড়ী গিয়ে দিদিকে দিয়ে বদনটাকে আচ্ছা বকুনি দেব।

ছেলেটির কথা বলবার ভঙ্গী ভারী মিষ্টি! বল্‌লাম— হ্যাঁ খুব জোরে বকুনি দেবে। দিদির কি দরকার, তুমি নিজেই দিও।

সুকুমার তৎক্ষণাৎ বললে—আমি? আমার কথা শুনবে! পাজিটা হাসবে—আমাকে মোটেই ভয় করে না। আমি ছেলে মানুষ কিনা, তাই। কিন্তু দিদি যখন বকে, তখন চুপ কোরে থাকে। দিদিকে ও ভারী ভয় করে।

কথা কইতে কইতে দু'জনে পথ অতিক্রম করছিলাম। এইবার সরু গলি ছেড়ে আমরা একটি অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় এসে পড়লাম। দেখতে দেখতে ৪৫নং বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। পুরানো ধরণের বাড়ী। সামনেই গেট। গেটের পিছনে ছোট্ট বাগান।

বাড়ীর দরজার কাছে এসে সুকুমার বললে—না, এ বাড়ী তো নয়। কিন্তু এই রাস্তার পিছনেই। এইবার ঠিক বুঝতে পেরেছি—কোন্‌টা আমাদের বাড়ী। চলুন।

তখন দু'জনে আবার অগ্রসর হলাম। বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন। পথের ধারে গ্যাসপোষ্টের আলোগুলি যেন টিম্ টিম্ করছে। দু'হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না, অন্ধকার আর কুয়াশায় চারিদিক এমনি দুর্নিরীক্ষ্য হ'য়ে উঠেছে। গলির মোড় ঘুরে, গোটা কয়েক বাড়ী পার হ'য়ে আর একটি গলির মধ্যে ঢুকে কিছুদূর গিয়ে ছেলেটি একটি অনতি-বৃহৎ বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললে—এই আমাদের বাড়ী।

বাড়ীর প্রকাণ্ড সবুজ-রঙা দরজার নীচে তিন ধাপ চওড়া সিঁড়ি। ভিতর থেকে তীব্র ইলেক্‌ট্রিক আলোর রেখা এসে পথের উপর পড়েছে। বাড়ীখানি দেখে মনে হয়, তার অধিকারী সামান্য অবস্থার লোক নন। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল এবং

একজন বয়স্থ লোক ক্ষিপ্র পদে বেরিয়ে এসে সামনে সুকুমারকে দেখে, অব্যক্ত আনন্দ-ধ্বনি ক'রে নিজের দুই প্রসারিত ব্যগ্র বাহুর মধ্যে তাকে টেনে নিলেন। আমি কতকটা হতবুদ্ধি হ'য়ে দরজার নীচে পথের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। বিস্ময়ের আতিশয্যে কিছুকালের জন্যে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তাঁর কথা শুনে বুঝেছিলাম, তিনিই সুকুমারের মামা। সুকুমারের মামা আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাবামাত্রই চিনতে পেরেছিলাম। পথের উপর বালকটিকে দেখতে পাবার কিছুক্ষণ আগে মোটরবিহারী যে-ভদ্রলোক তাঁর গাড়িখানি আমার পাশে দাঁড় করিয়ে ব্যগ্র দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়েছিলেন ইনি সেই ব্যক্তি। সেই রহস্য-গভীর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু, সেই দীর্ঘ সুবিন্যস্ত কেশরাজি এবং মুখের উপর সেই গর্ব্বিত বক্ররেখা। এক নিমেষে দু'খানি মুখ পাশাপাশি ভেসে উঠল। নিঃসংশয়ে বুঝলাম—কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মোটরকারের আধ-অন্ধকারের মধ্যে যাঁকে দেখেছিলাম, এখন নিকটে আলোর সম্মুখে তাঁকেই দেখছি।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গৃহস্বামী আমার দিকে ফিরে বললেন—অনেক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আজ আপনি আমার যে উপকার করলেন, জীবনে তা পরিশোধ করতে পারব না। আসুন, ভিতরে আসুন।

ইতঃস্তত করতে লাগলাম। ভিতরে যাব কি যাব না? একবার মনে হ'লো, কাজ নেই ভিতরে গিয়ে,

এখান থেকেই বিদায় গ্রহণ করি। পরক্ষণেই কি এক বিচিত্র অনুভূতির প্রেরণায় গৃহস্বামীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বাহিরে তখন আবার বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। রাত্রে বোধ হয় ভীষণ দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠবে।

চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কেন জানি না আমার বাঁ চোখ নেচে উঠল। তখন তা গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সেদিন যে গুপ্তচক্রান্তের আবর্তে পড়েছিলাম, ঐ বাঁ-চোখ নাচার মধ্যেই তার প্রথম সঙ্কেত লুকানো ছিল।

দুই

আসুন, আসুন। আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনার মত একজন পরোপকারী মহাশয় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

এই ব'লে গৃহস্বামী আমাকে ভিতরে নিয়ে দ্বার বন্ধ করে দিলেন। তারপর আমাকে সামনের বৈঠকখানা ঘরে এনে বসালেন। প্রশস্ত ঘর। আধুনিক রুচি অনুসারে সুসজ্জিত। একখানি আরাম-কেদারা আশ্রয় করে বসে পড়লাম। গৃহস্বামী আমার সম্মুখে একখানি ছোট কেদারা নিয়ে বসলেন।

—ছেলেটাকে কেমন কোরে কোথায় দেখতে পেলেন?

উঃ! কী ভাবনাই যে হচ্ছিল! বাপ-মা-মরা ছেলে, ওটাকে আমি ভারী ভালবাসি। হ্যাঁ, আপনার নামটী এখনো জানা হোল না। আমার নাম জগদীশ সেন। কলকাতায় যদিও অনেকদিন এসেছি, কিন্তু মশায়, সত্যি কথা বলতে কি, এ সহরে আমার একেবারেই ভাল লাগে না। চিরকাল বাইরে বাইরে কেটেছে কি না, বোধ হয়, সেই জন্মেই ভাল লাগে না। এই দেখুন না কেন, এতদিন এ জায়গাটাতে আছি, কিন্তু এ অঞ্চলের কারুর সঙ্গে এখনো চেনা-শুনা হয়নি। আজ আমার অনেক সৌভাগ্য তাই আপনাকে পেলাম।

বললাম—আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া বিশেষ কোন সৌভাগ্য ব'লে মনে করবেন না, কারণ আমি অতি সামান্ত লোক। আমার নাম বিজয় গুপ্ত। আমি থাকি শ্যামবাজার অঞ্চলে; এখানে এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে এসেছিলাম। ফেরবার পথে আপনার ভাগনেকে দেখতে পাই।

এই ব'লে, কেমন করে, কোথায় সুকুমারকে দেখতে পেয়েছিলাম, বিশদভাবে তার বর্ণনা দিলাম। শুনে জগদীশবাবু আর এক দফা আমায় ধন্যবাদ দিলেন। তারপর হঠাৎ দু'হাত একত্র করে তালি দিয়ে উঠলেন। প্রথমটা তাঁর এই আকস্মিক আচরণে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। পরক্ষণেই বুঝলাম, অমন ক'রে তিনি হয়ত চাকর-বাকর কাউকে ডাকছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুমান সত্য হ'লো। দেখলাম, পাশের

দরজা ঠেলে এক দীর্ঘাকৃতি মুসলমান খানসামা ভিতরে এসে দাঁড়াল। তার মোটা আর চাপা ঠোঁটে নির্বিকার ভাব, চোখ-মুখে বুদ্ধি এবং বিনয়ের দীপ্তি। উপযুক্ত প্রভুর উপযুক্ত খান্‌সামাই বটে!

জগদীশবাবু বললেন—রহিম; দু'কাপ কোকো নিয়ে এসো, জল্‌দি।

বললাম—আমি এইমাত্র নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছি যে···

জগদীশবাবু বললেন—তা'হোক, তা'হোক। এই ঠাণ্ডায় ভিজে এসেছেন, একটু গরম কোকো খেলে আপনার উপকার হ'বে।

আদেশ পেয়ে রহিম নিঃশব্দে প্রস্থান করলে।

বললাম—দেখে মনে হয়, খানসামাটি আপনার খুব কায়দা-দুরস্ত। অনেক দিন আপনার কাছে আছে বুঝি?

—অনেক দিন। যখন বাইরে ছিলাম, তখন ওকে সংগ্রহ করি। খুব বিশ্বাসী এবং খুব কাজের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ট্রের উপর দু'পেয়ালা ধূমায়মান কোকো নিয়ে রহিম ঘরে ঢুকলো এবং কাপ দুটা আমাদের হাতে দিয়ে নিঃশব্দে অদূরে দাঁড়িয়ে রইল।

—ললিতা ফিরে এসেছে রহিম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এইমাত্র এলেন।

রহিমের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙা, হঠাৎ শুনলে চমকে উঠতে হয়। কিন্তু সে বাঙলা বললে অতিশয় পরিষ্কার।

বুঝলাম বাঙালীর বাড়ী কাজ ক'রে ভাষাটাকে সে ভাল কোরেই আয়ত্ত কোরে নিয়েছে।

—তাকে একবার এখানে আস্‌তে বল।

জগদীশবাবুর কথায় জান্‌লাম, ললিতা তাঁর ভাইঝি। তাঁর নিজের ছেলেপুলে নেই, তাই ওই ভ্রাতুষ্পুত্রীই তাঁর যথাসর্ব্বস্ব। তাকে এবং ভাগিনেয় সুকুমারকে নিয়েই তাঁর সংসার।

জগদীশবাবুর কথা শেষ হ'বার পূর্ব্বেই দ্বার মুখে একটী মেয়েকে দেখলাম। বুঝলাম ইনিই ললিতা, জগদীশবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

ভিতরে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে ব'সে থাকতে দেখে ললিতা সঙ্কোচ বোধ করছিল। অতিশয় মৃদু কণ্ঠে বললে—আমায় ডাকছেন, কাকাবাবু?

—হ্যাঁ, এদিকে এসো, নেমন্তন্ন খেয়ে এই এলে বুঝি? এত দেরী হ'লো যে? বড্ড ভাবছিলাম। আজকের ব্যাপার শুনেছ তো? ইনি শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত, ইনিই ছেলেটাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন, এঁর কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। বিজয়বাবু এ হচ্ছে আমার ভাইঝি ললিতা।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার করলাম।

ললিতা দাঁড়িয়ে আছে দেখে নম্র কণ্ঠে বললাম—আপনি বসুন।

ললিতা আমার অদূরে খুল্লতাতের গা ঘেঁসে একখানি ছোট চৌকিতে বসল।

চমৎকার মেয়েটী! ফোটা-ফুলের স্তবকের মতো উদ্ভাসিত দেহলতা, সৌন্দর্য্যে এবং সুষমায় অনিন্দ্যসুন্দর! অনতি-যৌবনের অনুগ্র দীপ্তি মেয়েটীর দুটী টানা টানা চোখের কিনারায় যেন কাজলের রেখা টেনে দিয়েছে। পাৎলা দু'খানি ঠোঁটে করুণ মমতা মাখানো।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

*   *   *   *

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলবার পর ললিতার সঙ্কোচ আর জড়তা অনেকখানি ক'মে গেল। সস্মিতমুখে সে তখন আমার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করতে লাগল। জগদীশবাবু অন্যমনস্ক ভাবে ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে সহসা আবার তাঁর হাত-তালির শব্দে চকিত হয়ে উঠলাম। মুখ ফেরাতেই দেখলাম, নির্ব্বিকার মৌন মুখে রহিম এসে দাঁড়িয়েছে।

জগদীশবাবু বললেন—ললিতার জন্যে দুধ নিয়ে এসো রহিম।

তাঁর এই কথা শোনবামাত্রই ললিতা যেন শিউরে উঠল। ভীত কণ্ঠে বললে—না কাকাবাবু, আমি দুধ খাব না।

সহসা তার এতখানি ভয় এবং বিহ্বলতার কারণ খুঁজে পেলাম না।

জগদীশবাবু গম্ভীর স্বরে বল্লেন—হ্যাঁ, একটু দুধ খেতে হ'বে।

—না, আমি খাবো না। কিছুতেই খাব না।

দেখলাম, উত্তেজনায় এবং আশঙ্কায় ললিতার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তার ভয়ার্ত বিহ্বল ভাব দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি রৈল না। সামান্য একটু দুধ খেতে বলায় ললিতার এত আপত্তিই বা কেন এবং আপত্তি সত্ত্বেও তাকে দুধ খাওয়াবার জন্য খুড়ো মশায়েরই বা এতখানি জবরদস্তি কেন? আশ্চর্য্য ব্যাপার! ললিতা আর একবার আপত্তি করতেই জগদীশবাবু ভীষণ চটে উঠলেন। তাঁর চোখ মুখ ক্রোধে কুঞ্চিত হোয়ে উঠল। তাঁর মূর্ত্তি দেখে ললিতা অধিকতর ভীত হয়ে পড়ল।

তখন আমি আর থাক্তে না পেরে জগদীশবাবুকে উদ্দেশ করে বল্লাম—ওঁর যখন এত আপত্তি, তখন না হয় দুধ আজ আর নাই খেলেন!

—না। ওর একগুঁয়েমি আমি ভাঙবো। জগদীশবাবু বললেন।

ললিতা আর্ত্তকণ্ঠে বললে—আপনার পায়ে পড়ি কাকাবাবু আজ আমি দুধ খাবো না।

দুই চোখে তার যেন মৃত্যুর আতঙ্ক!

জগদীশবাবু কিন্তু অটল। বললাম-এ কিন্তু আপনার অন্যায় মিঃ সেন! একজনকে জোর করে কোন কাজ করানোর মধ্যে কোন পৌরুষ নেই।

রহিম এক বাটী দুধ হাতে কোরে এসে দাঁড়াল। জগদীশবাবু আমার কথায় কর্ণপাত না কোরে ললিতাকে উদ্দেশ করে বললেন—এক্ষুনি খেয়ে ফেলো। এখনো যদি অবাধ্যতা কর তাহলে আমি এই ভদ্রলোককে সমস্ত কথা ব'লে দেব।

তাঁর এই কথা উচ্চারিত হবা মাত্র ললিতার আচরণে ও চোখে মুখে অদ্ভুত ভাবান্তর দেখা গেল।

—না, না, না। আমি এক্ষুনি খাচ্ছি! ব'লে সে এক নিমেষে তার আপত্তি ভুলে দুধের বাটীর জন্য হাত বাড়াল।

বললাম—একী জবরদস্তি! আপনি খাবেন না দুধ। বলুন উনি কী কথা বলবেন! আপনার কাকা যদি না বলেন, আপনিই বলুন। আপনার কোন ভয় নেই।

জগদীশবাবুর মুখের উপর কুটিল হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলেন—হ্যাঁ, বলুক। পারে ত বলুক না!

ললিতা দু'হাতে তার মুখ ঢেকে ফেললে।

কিছুক্ষণ পরে যখন মুখ অনাবৃত করলে, তখন তার সেই কমনীয় সুন্দর মুখখানি কেমন যেন কুৎসিৎ নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। কোন কথা না ব'লে রহিমের হাত থেকে দুধের পাত্রটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু দুধ পান কোরে পাত্রটা খান্‌সামার হাতে ফিরিয়ে দিলে। তারপর, একবার আমার দিকে আর-একবার পিতৃব্যের দিকে করুণ-চোখে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছি।

তিন

জগদীশবাবু তখন আবার আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। ক্ষণ-পূর্ব্বের বিশ্রী আবহাওয়াটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বল্লাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। অল্প স্বল্প ব্যবসাই আছে। এক সাহেবের সঙ্গে কাজ করি। আপিস? হ্যাঁ, ষ্ট্রাণ্ড রোডে ছোট্ট একটা আপিসের মত আছে, তবে কাজ যা হয় সব সাহেবের বাড়ীতে—বারাকপুরে।

—বারাকপুরে? বারাকপুরে আপনার কাজ হয়? বটে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ফী শনিবার যাই। সাহেবের বাড়ীতেই থাকি। রবিবার সমস্ত-দিন হিসেব পত্র দেখা-শোনা এবং অন্যান্য কাজকর্ম্ম করি। সোমবার দিন সকালে সাহেব আর আমি দু'জনে একসঙ্গেই কল্‌কাতায় আসি।

—বেশ, বেশ। তা, শনিবার কোন্ সময় বারাকপুর যান?

—বিকেলে ৫টা নাগাদ সেখানে গিয়ে পৌঁছুই।—বললাম—কেন বলুন তো? আপনার সেখানে যাতায়াত আছে না কি?

—খুব আছে। বারাকপুরে আমার একখানা বাগান আছে কি না তাই প্রায়ই আমি বারাকপুরে যাই। বাগানের সংলগ্ন একখানি ছোট বাড়ীও আছে। সেইখানেই গিয়ে থাকি।

বলরাম—বটে। এইবার শনি-রবিবার যখন সেখানে যাবেন, তখন আপনার সঙ্গে দেখা করব। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি কি কলেজের প্রফেসর ?

জগদীশবাবুর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।

—প্রফেসর ? না বাপু; প্রফেসর-টফেসর আমি নই। আমি বিশেষ কোন কাজ করি না। আচ্ছা, পেন্টিং, চিত্রশিল্প এসব বিষয়ে আপনার আগ্রহ আছে ?

বলরাম—নিশ্চয়ই আছে। ছোট-বেলায় তিন-চার বছর আর্ট-স্কুলে পড়েছিলাম। তার রেশ এখনো কিছু কিছু আছে। কেন বলুন তো ?

—কয়েকখানা ছবি আমার আছে। সেগুলি অত্যন্ত অসাধারণ। সে রকম অয়েল-পেন্টিংএর কাজ আপনি হয়ত আর দেখেন নি। যদি আগ্রহ থাকে দেখাতে পারি।

—খুব আগ্রহ আছে।

—তা হলে আমার সঙ্গে আসুন। ব'লে জগদীশবাবু উঠলেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে হল্ পার হ'য়ে দোতলায় যাবার সিঁড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির কাছে রহিম দাঁড়িয়েছিল—তেমনি স্তব্ধ তেমনি নির্ব্বিকার। তার উজ্জল তীক্ষ্ণ চক্ষু দু'টো আমার প্রতি নিবদ্ধ। তার সেই ক্রুর দৃষ্টি দেখে মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলাম। জগদীশবাবু অগ্রসর হ'য়ে গিয়ে তাকে কি যেন বললেন, বুঝতে পারলাম না। পরক্ষণেই রহিম নিঃশব্দ পদক্ষেপে সরে গেল।

জগদীশবাবু ও রহিমের আচরণ কেমন যেন ভাল লাগল না।

* * *

ছবিগুলি দেখে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। লম্বা ঘরগুলির দেওয়াল জুড়ে খান-বিশেক ছবি টাঙানো। প্রত্যেক ছবি খানিতেই মানুষের মর্মান্তিক যন্ত্রণাকে রূপ দেওয়া হয়েছে···মৃত্যুর মর্মন্তুদ যাতনা। প্রত্যেক ছবিখানির মধ্যেই সুদক্ষ শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ-পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বল্লাম—হ্যাঁ, আশ্চর্য্য ছবি বটে। অদ্ভুত।

পরম সন্তোষের হাসি হেসে জগদীশবাবু বল্লেন—অদ্ভুত শক্তি ছিল এই শিল্পীর। ছ'মাস আগে সে মারা গেছে। তার এই ছবিগুলির একটা প্রদর্শনী করব। ছবিগুলির খুব নাম হবে, কি বলেন?

জগদীশবাবুর শেষ কথাগুলি আমার কাণে প্রবেশ করল না; আমি তখন দেওয়ালের ওধারে টাঙানো একখানি ছবির প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিলাম। ছবিতে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের মুখ আঁকা এবং তার পিছনে একটা পিশাচাকৃতি দানব দাঁড়িয়ে দু'হাতে মেয়েটীর গলা টিপে ধরেছে। অবাক্ত যন্ত্রণায় মেয়েটীর মুখের উপর যে করুণ ভাব ফুটে উঠেছে তা দেখে শিউরে উঠলাম। একবার, গুণে ছবিখানা বেশ জীবন্ত দেখাচ্ছে। ছবিখানি সদ্য-অঙ্কিত ব'লে মনে হোলো।

অনন্যচিত্ত হয়ে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ ঘরের সমস্ত আলো একসঙ্গে নিবে গেল!

চকিত হ'য়ে 'একি হোলো' বলে পিছন ফিরে দেখলাম, জগদীশবাবু অন্তর্হিত হয়েছেন। সেই ঘোর অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে একাকী আমি।

প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই প্রাণপণে চীৎকার কোরে জগদীশবাবুকে, রহিমকে এমন কি ললিতার নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলাম। সে-চীৎকারে মরা-মানুষও, বোধ করি জেগে উঠে সাড়া দিত, কিন্তু যাদের ডাকলাম তাদের কোন উত্তরই পেলাম না।

অত্যন্ত ভয় হলো। একী পাগল না শয়তানের দ্বারা এভাবে বন্দী হোলাম। এর অর্থ কী? জগদীশবাবু লোকটা কি পাগল না শয়তান? কে জানে, তিনি নিজেই হয়ত এই বীভৎস ছবিগুলি এঁকেছেন। মানুষের দেহ-প্রমাণ সুবৃহৎ ছবিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যে হিম শিহরণ অনুভব করতে লাগলাম। জান্‌লা দরজা সবগুলিই বাইরে থেকে বন্ধ। ঘরের মধ্যে এতটুকু আলো নেই। কাছে দিয়াশেলাই ছিল না। অনুমানে নির্ভর কোরে ঘরের আলো জ্বালবার সুইচ খুঁজতেই লাগলাম।

কিছুক্ষণ খুঁজতেই সুইচ্‌টা হাতে ঠেকলো। সুইচটার গড়ন কতকটা বোতামের মতো। সজোরে টিপে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট চীৎকার করে হাত সরিয়ে নিলাম। বোতাম টিপতেই তার গাত্র-সংলগ্ন একটা সুতীক্ষ্ণ সূচের

অগ্রভাগ আমার আঙুলের ভিতর ফুটে গিয়েছিল। আঙুলের ভিতর অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম।

আলো জ্বললো না।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বাইরে যাবার দরজা খুঁজছি—ধাক্কা দিয়ে, জোর করে কোন মতে দরজা খুলে যদি বাইরে যেতে পারি—এই আশায় দরজা খুঁজছি, এমন সময় হাত লেগে দেওয়ালের একখানি ছবি নড়ে উঠলো; এবং তারপরেই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো।…

হাত লাগতেই ছবিখানি নড়ে উঠে ধীরে ধীরে দেওয়াল সমেত একপাশে অনেকখানি সরে গেল এবং সেই ফাঁকের ভিতর অন্ধকার গহ্বরের মতো একটা গুহা দেখা গেল।…কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম সেটা গহ্বর নয়; একটী ক্ষুদ্রকায় গুপ্ত-গৃহ। আর-এক পা অগ্রসর হোতেই, কী একটা নরম জিনিসের উপর পা পড়লো।…কিসের উপর পা পড়লো। কিসের উপর পা দিলাম, নীচু হয়ে তা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমার সারা দেহ আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল।

প্রথমে পরণের কাপড়ের উপর হাত পড়লো, তারপরেই হাত বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, যা পরীক্ষা করছি তা একটি অচেতন অথবা মৃত নারীদেহ!…

সেই সময় মনে হলো যেন আমার মাথা ঘুরচে।…কি এক অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতির স্পন্দনে আমার সারা দেহ ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত হ'য়ে উঠতে লাগল।…মনে হলো যেন কণ্ঠনালী

এবং বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, এখুনি বুঝি বন্ধ হ'য়ে যাবে।

আর-একবার নীচু হ'য়ে মৃতদেহের মাথায় এবং গলার কাছে পরীক্ষা করে সুনিশ্চয়ে বুঝলাম, দেহ কোন স্ত্রীলোকেরই বটে। গলার কাছে হাত দিতেই একটা সরু চেন-হার হাতে ঠেকলো। হারের প্রান্তে একটি মাতুলী বাঁধা।

কার দেহ? বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে গেলাম।...মাথা ঘুরছে।.. দু চোখে গাঢ় অন্ধকার।...কোথা থেকে এ কি হ'য়ে গেল।...আমার বিরুদ্ধে এ গুপ্ত-চক্রান্তের অর্থ কি?

চার

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে অতিবাহিত হল।

পায়ের কাছে যে মৃতদেহ স্পর্শ করছি,- আমার ভাগ্যেও হয়ত তারই মত শোচনীয় পরিণতি অপেক্ষা করছে। যে পিশাচের দল এই মেয়েটিকে এরূপ নির্মম ভাবে হত্যা করেছে, আমার জন্যে হয়ত এতক্ষণে তারা সেই ব্যবস্থারই পুনরায়োজন করছে।

বন্ধ-গৃহ থেকে মুক্তিলাভের জন্য সারা মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। কিন্তু কোথায় মুক্তি? চীৎকার করবার চেষ্টা করলাম। গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।...কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হলো যেন স্নায়ু ও পেশীর শক্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হ'চ্ছে। শরীরের

ভিতর তীক্ষ্ণ বেদনার প্রবাহ! ··· যে হাতে সুইচ টিপতে গিয়ে সুচ ফুটে গিয়েছিল, সেই হাতখানা পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মতো অবশ হ'য়ে আসছে।

পরক্ষণেই দু'চোখ গাঢ় ঘুমে মুদ্রিত হয়ে এলো।

* * *

বোধ করি অতি অল্পক্ষণের জন্যই অজ্ঞান হ'য়ে ছিলাম। জ্ঞান হোতে দেখলাম, সেই গুপ্ত-কক্ষ থেকে আমাকে পাশের বড় ঘরে একখানি আরাম কেদারার উপর বসানো হ'য়েছে। ঘরের সমস্ত আলোগুলি জ্বলছে।·· তাদের তীব্রতায় দু'চোখ যেন ঝলসে গেল।···সম্মুখে চাইতেই দেখলাম, সেই ভীষণাকৃতি মুসলমান রহিম আমার অতিশয় সন্নিকটে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। দুইচোখ তার যেন দুই জ্বলন্ত গোলা। কালো মুখের উপর তার শুভ্রদন্তপংক্তির শোভা যেন শয়তানের মুখের হাসির মতো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

কথা বলতে চেষ্টা করলাম, তাকে ধমক দিয়ে তীব্র ভাবে কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু দেখলাম জিভ, অসাড়-নিস্পন্দ হ'য়ে গেছে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যদিও তখন আমি সম্পূর্ণ চেতনা লাভ করেছি, আমার দেহের শক্তি তখনো ফিরে আসেনি।

বাক্যহীন বিহ্বল হ'য়ে ব'সে রইলাম।

থেকে থেকে বুকের মধ্যে অতি দ্রুত স্পন্দন অনুভব করছিলাম থেকে থেকে মনে হচ্ছিল যেন, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রমশঃ নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হ'তে লাগল।··· চোখের সম্মুখে

ইলেকট্রিক-আলোগুলো যেন দূর হ'তে আরো দূরে চলে যাচ্ছে···সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র দুকূল তার ভীষণ অন্ধকার; ধীরে ধীরে আমি যেন সেই সমুদ্রের মাঝে তলিয়ে যাচ্ছি।

আমার সম্মুখ থেকে কালো মতো কী যেন একটা সরে যাচ্ছে। কী সে? দেখলাম, রহিম ধীর পদে আমার নিকট থেকে তফাতে গিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। ঠাহর করে চেয়ে দেখলাম, অদূরে একটী শিল্পীর ইজেল দাঁড় করানো রয়েছে, এবং তার পিছনে একজন লোক ব'সে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তুলি চালাচ্ছে! কে ও? আঁক্‌ছেই বা কি? চেষ্টা ক'রে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে লক্ষ্য করে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

জগদীশবাবু আমার সেই মৃত্যুভয়াঙ্কিত মুখের ছবি তুলির লেখনে ফুটিয়া তুলছেন! বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

যে মেয়েটীর মৃতদেহ ক্ষণ-পূর্ব্বে স্পর্শ করেছি, তার কথা মনে পড়ে দেহ অবশ হ'য়ে এলো। এম্‌নি ক'রে সে মরেছে। এবং এম্‌নি কোরেই তার মৃত্যু-যন্ত্রণাকাতর মুখ ওই পিশাচ শিল্পী তুলির রেখায় ফুটিয়ে তুলেছে!

ঘরের প্রত্যেকখানি ভীষণ চিত্রই কি এম্‌নি কোরে অঙ্কিত হ'য়েছে? খুব সম্ভব তাই। কথাটা ভাবতে ভাবতে দম বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভিতর বহু সংখ্যক মৃত্যুকাতর নর-নারীর মুখ যেন জীবন্ত হয়ে উঠে আমার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালো।···

অদূরে ব'সে ক্ষিপ্রগতিতে জগদীশবাবু এঁকে চলেছেন।

এক-একবার মুখ বাড়িয়ে তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইছেন, তারপর আবার তুলি বোলাচ্ছেন!

সমস্তই বুঝলাম। গোপনে গোপনে জগদীশবাবু কিছুদিন থেকে আমাকে তাঁর শীকার সাব্যস্ত করে রেখেছিলেন। সেদিন সুবিধা বুঝে বালক সুকুমারকে দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে এনেছে। আমার পরিত্রাণ নেই।

সহসা রহিম আমার সম্মুখে এসে নাকের কাছে একটা রুমাল নাড়তে লাগল।...প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলাম না, তারপরেই কি একটা তীব্র গন্ধ নাকের মধ্যে ঢুকতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপরেই গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেলাম।

* * *

ঘুম ভাঙতেই মনে হ'লো যেন বাঁচলাম। এমন ভীষণ দুঃস্বপ্নও মানুষে দেখে!

উঠে বসে চোখ দু'টো মুছে দেখলাম নিজের ঘরে নয়, আমি একটা ডাক্তার খানায় বেঞ্চের উপর শুয়ে আছি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—বেলা আটটা।

পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম, দেহ আমার এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং গতরাত্রের ঘটনাগুলি স্বপ্ন নয়, অত্যন্ত সত্য।

উঠে বসতেই, পাশে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি প্রশ্ন করলেন—এখন কেমন বোধ করছেন?

ভালো করে চেয়ে বুঝলাম, প্রশ্নকর্ত্তা একজন ডাক্তার।

বললাম—এ আমি কোথায় এসেছি?

—ডাক্তারখানা। শরীর কেমন লাগছে এখন?

ওধার থেকে একজন বলে উঠলো—মাত্রাটা বেশী হোয়ে পড়েছিল। সামলাতে পারেন নি আর কি!

ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বললাম—অত্যন্ত খারাপ বোধ করছি এখনো। কাল ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম।

পাশের লোকটি বললে—মাত্রা বেশী হয়ে গেলে অনেকেই ওই রকম সাফাই গায়।

উঠে বসে বললাম—না, মাত্রা বেশী হওয়া দূরে থাক, মদ আমি ছুঁই নি। কিন্তু সে কথা যাক্, আমায় বলুন—কেমন কোরে আমি এখানে এলাম। আমাকে আপনারা কোথায় পেলেন?

পাশের লোকটি এইবার আমার সামনে এলো; দেখলাম, লোকটি পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টর। দূরে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার বুঝতে না পেরে বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম।

সাব-ইন্‌স্পেক্টারটি আমার কথার উত্তর দিলেন। কাছে এসে বললেন—লেকের ধারে অজ্ঞান অবস্থায় আপনাকে পাওয়া গিছল। কনস্টেবল গিয়ে আমাকে খবর দেয়। আমি প্রথমে আপনাকে মাতাল মনে করে থানায় নিয়ে যাবার হুকুম দি। পরে আপনার অবস্থা দেখে এইখানে নিয়ে এসেছি।

ডাক্তার বাবু বললেন—খুব সমীচীন কাজই করেছেন। মদ খাওয়ার কেস এ নয়। এ অন্য কিছু ব্যাপার।

বললাম—আমাকে বিষ খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল! কি কোরে আমি বেঁচে আছি! আশ্চর্য্য!

—বিষ খাইয়ে দিয়েছিল। কে? কারা? কেমন কোরে।

—সে সব বলব পরে। কিন্তু আমি তো ছিলাম, বালিগঞ্জ ষ্টেশনের ধারে এক বাড়ীতে! লেকের কাছে এলাম কি কোরে?

সাব ইন্‌সপেক্টর উত্তর দিলেন—তা বলতে পারিনে মশায়। কনস্‌টেবল থানায় খবর দেয় একটি লোক লেকের ধারে জলের কাছে প'ড়ে আছে। বোধ হয় মারা গেছে। গিয়ে দেখলাম—অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন বটে কিন্তু মারা যান্‌নি,—পাশে যে সব লোকগুলো দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজনের মুখে শুনলাম—শেষ রাত্রে একখানা মোটর ঐ বরাবর এসে থেমেছিল এবং তার মধ্যে থেকে দুজন লোক ধরাধরি কোরে আপনাকে নামিয়ে রেখে দিয়ে মটর চালিয়ে চলে গিছল।

আশ্চর্য্যান্বিত হলাম, এবং মৃত্যুর পথ থেকে আমার এই অভাবনীয় মুক্তির জন্য মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

ইন্‌সপেক্টর তখন বললেন—দেখুন, দেখে শুনে মনে হ'চ্ছে ঘটনাটি নিতান্ত সহজ বা সাধারণ নয়। এর মধ্যে নিশ্চয় কোন গোল আছে। আপনার কাছে সব কথা শুনলে আমরা তদন্ত কোরে দেখতে পারি।

প্রথমে মনে হ'লো, সকল কথা প্রকাশ করে বলি, তারপর ভাবলাম, লোকে কথায় বলে পুলিশের লোকের সংস্পর্শে আসা বাঘের সংস্পর্শে আসার অধিক বিপদজনক। এদের কোন সংস্পর্শে না যাওয়াই, তদন্ত যত বন্ধুত্ব আর যাই ভদ্রতা দেখাক

এরা কৈফিয়তের জেরায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলবে। তাছাড়া সত্য কথা বলতে গেলে, ললিতার কথাও বল্‌তে হয়। পুলিশের কাছে তার কথা বল্‌তে আমার একেবারেই ইচ্ছে হলো না। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, নিজেই এ ব্যাপার তদন্ত করে দেখব। নিজে না পারি, তখন পুলিশের সাহায্য নিলেই চল্‌বে।

বল্লাম—ঘটনা বিশেষ আর কি! বিষ প্রয়োগের কথাটা আমার অনুমান মাত্র। আমার শরীর ভিতরে ভিতরে খারাপ হয়েছিল তাই হয়ত অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিলাম। আর লোকেরা যে বলছে, দুজন লোক আমায় গাড়ি ক'রে এনে লেকের ধারে নামিয়ে দিয়ে গেছে, ওসব একেবারেই মিথ্যে। যাই হোক, আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আমি এবার বাড়ী যাব। আমায় দয়া করে একখানা গাড়ী আনিয়ে দিন। আর, নিজেরা যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার দরুণ, মনে কিছু করবেন না,...এ অতি সামান্যই। দয়া ক'রে গ্রহণ করুন।

পুলিশ কর্ম্মচারিটী মৃদুহেসে হাত থেকে নোট ক'খানি নিয়ে নিমেষের মধ্যে তাদের পকেটে চালান ক'রে বল্লে না, না কষ্ট আর কী। এ আমাদের কর্ত্তব্য। আচ্ছা, আপনার গাড়ী এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি। নমস্কার!

এই বলে তিনি কনেষ্টবল সহ অদৃশ্য হলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

* * *

একদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর দেহ মনে সুস্থ হ'য়ে

ব্যবসার অংশীদার রে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। সাহেব আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠল।

—ব্যাপার কি গুপ্ত কদিন কোন পাত্তাই নেই। শুনলাম, আজকাল নাকি যার তার সঙ্গে মিশে যা-তা কাণ্ড কোরে বেড়াচ্ছ?

বল্লাম—চিন্তিত হয়ো না বন্ধু। দুর্ভাবনার কথা বটে' কিন্তু সে অন্য ব্যাপার।

এই ব'লে তার কাছে কিছু কিছু প্রকাশ করলাম। শুনে ইংরাজ তনয় মন্তব্য করলে—বশ, অর্থাৎ বাজে।

তখন তাকে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা খুলে বললাম,—ললিতার কথাও বাদ দিলাম না।

সকল কথা শুনে সাহেব অতিশয় আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে—তোমাদের দেশে যে এ-রকম অসাধারণ দানবীয় লোক থাকতে পারে বা এ রকম অসাধারণ ঘটনা ঘটতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। এ যেন আমাদের দেশের কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাস শুনছি। যাই হোক, এখন কি করবে ঠিক করলে। আমার তো মনে হয়, পুলিশ নিযুক্ত করাই ভাল।

বললাম—না, আগে কিছুদিন নিজেই তদন্ত করব, তারপর না পারি, তখন পুলিশে খবর দেওয়া যাবে। আপাততঃ চললাম বালিগঞ্জ। জগদীশ সেন-এর সেই বাড়ী খুঁজে বার করে তবে অন্য কাজ। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার পিস্তলটা আমায় দাও। কিছুদিন ওটা আমার কাছেই থাকবে। কী জানি বলা যায়না, হয়ত দরকারে লাগতে পারে।

সাহেবের কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে, কোটের পকেটে লুকিয়ে তাকে রেখে, বালিগঞ্জ-অভিযানে যাত্রা করলাম।

পাঁচ

যে-রাত্রে আমি জগদীশের কবলে পড়ে মৃত্যুর পথে রওনা হয়েছিলাম, সে-রাত্রি ছিল যেমন অন্ধকার তেমনি কুয়াশাচ্ছন্ন; কিছুই ভাল কোরে দেখা যাচ্ছিল না। তাই আজ দিবালোকে সেদিনের পথ চিনে নিতে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়লাম ঘুরতে ঘুরতে ষ্টেশনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে একটী ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম—মশায়, বলতে পারেন, এখানে চিত্রগুপ্তের লেন কোনখানটায় পড়বে? (রাস্তার আসল নামটী গোপন ক'রে পাঠক-পাঠিকার কাছে তাকে চিত্রগুপ্তের লেন বোলে অভিহিত করব)।

ভদ্রলোক বললেন—অনেকটা দূরে এসে পড়েছেন। বালিগঞ্জ পার্ক ছাড়িয়ে কয়েক-পা দূরে এসেই প্রথম বাঁদিকে যে-গলি পাবেন, তার ভিতর ঢুকে গেলেই ডান দিকে চিত্রগুপ্তের লেন।

ধন্যবাদ দিয়ে পা চালালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গন্তব্যস্থানে এসে পড়লাম।

এই কি চিত্রগুপ্তের লেন? সেদিন কী এই রাস্তায় সুকুমারের হাত ধরে এসেছিলাম? কে জানে! ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাহোক, দেখা যাক। বাড়ীর নম্বরটা জানা আছে। ছেলেটা বলেছিল—৪৫ নম্বর। খুঁজতে খুঁজতে ৪৫ নম্বরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এই কি সেই দুরভিসন্ধিকারী মরণ-শিল্পীর বাড়ী—যেখানে মানুষকে তিলে তিলে হত্যা করবার

নিষ্ঠুর আয়োজন প্রস্তুত রয়েছে ? বুকের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বিপাকের সাথী পিস্তলটাকে স্পর্শ করে সাহস সংগ্রহ করলাম। তারপর দরজার সুমুখে গিয়ে সজোরে কড়া নাড়লাম।

একবার, দুবার, তিনবার। ভিতরে কোন সাড়া নেই। আবার দ্বিগুণ জোরে কড়া নাড়লাম। এবার ভিতরে লোক চলাচলের শব্দ হ'লো। তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল।

দু'পা পিছিয়ে এসে দাঁড়ালাম।

যে-ব্যক্তি দরজা খুললে, বুঝলাম, সে বাড়ীরই কোন লোক, চাকর-বাকর নয়। সুশ্রী চেহারা। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। আমার মুখের পানে তাকিয়ে বল্লে—কাকে চান ?

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন হয়ে রইলাম। ভুল করেছি; বোধ হয় এবাড়ী নয়। তবুও প্রশ্ন করলাম—জগদীশবাবু আছেন বাড়ীতে ?

জগদীশবাবু বাবু ?—ছোকরাটি যেন আকাশ থেকে পড়ল, বল্লে—জগদীশবাবু বোলে তো কেউ এখানে থাকেন না !

বল্লাম—সে কী ! আমি যে কয়েকদিন আগে এই বাড়ীতেই এসেছিলাম—সন্ধ্যের সময়। আচ্ছা, সুকুমার আছে তো ? সুকুমার ! তাকে একবার ডাকুন তো !

যুবকটী এবার হেসে ফেল্লে; মাথা নেড়ে বল্লে—ভয়ানক ভুল করেছেন। যাদের নাম করেছেন তারা এ বাড়ীতে থাকেন না—কখনও ছিলেনও না। আপনি নিশ্চয়ই বাড়ী ভুল

বল্লাম—তা হ'তে পারে। আচ্ছা এ বাড়ীর কর্তার নাম [illegible]
তিনি কি করেন জান্‌তে পারি কি?

যুবক কয়েক মিনিট ভুরু কুঞ্চিত ক'রে রইল, তারপর বল্লে—আপনার এ প্রশ্নের উত্তর না-ও দিতে পারতাম; কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, আপনার নিশ্চয়ই কোথাও একটা মস্ত ভুল হোয়েছে, এবং আপনি কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছেন—তাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। এ বাড়ীর যিনি মালিক, তাঁর নাম—শ্রীযুক্ত রমণী মোহন রায়; তিনি ব্যারিষ্টার; যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন হয় যে-কোনদিন সকাল নটার মধ্যে আসবেন—দেখা হবে। আপনাকে দেখে এবং আপনার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হ'চ্ছে, কেউ যেন আপনাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে।

আমি ততক্ষণ পথে নেমে পড়েছি। কি মুস্কিল! শেষ কালে কি না প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রমণীমোহন রায়ের বাড়ী চড়াও হোয়ে খুনী আসামী ধরতে এসেছি!

যুবকের নিকট নিজ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোরে সরে পড়লাম।

* * *

গলির মোড়ে এসে দাঁড়াতেই চকিত হয়ে উঠলাম। কী আশ্চর্য্য! এই তো সেই গলির মোড়, যেখান দিয়ে বালকের হাত ধ'রে সে-দিন রাত্রে পথ চলেছিলাম। গলির মোড়ে, রাস্তার মধ্যখানে একটি স্তম্ভের উপর ঠিক সেই তিনটি গ্যাসের আলো বসানো রয়েছে! এই পথ দিয়েই সেদিন এসেছিলাম—তাতে সংশয় নেই, কিন্তু কোন বাড়ী? প্রথমে দু'জনে যে বাড়ীর

সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সে-বাড়ীটিকেও খুঁজে পাচ্ছি না। অন্ধকারে কয়েক মুহূর্তের জন্য সে-বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম তাই তাকে হয়ত চিনে বের করতে পারব না। না পারি, কিন্তু যে-বাড়ীতে এসে সে রাত্রে প্রবেশ করেছিলাম, যে-বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে জগদীশ আমাকে অভ্যর্থনা করলে, যে বাড়ীর মধ্যে বাস করে এক অনিন্দ্য-সুন্দরী তরুণী মেয়ে, জীবনের এই প্রথম যে আমার মনে অনুরাগের রঙ ধরিয়েছে, যে-বাড়ীর মধ্যে মানুষ আর ফিরে আসে না, মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে নিষ্ঠুর শিল্পীর তুলিকার মুখে নিজের কাতর আকৃতি অঙ্কিত কোরে তোলে—সে-বাড়ী কোথায় গেল? তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু কেমন ক'রে? এ পথের সকল বাড়ীগুলিই অল্প বিস্তর একই ছাঁচে প্রস্তুত—দরজার মুখে প্রায় সকল বাড়ীরই দু'তিন ধাপ সিঁড়ি আছে; সদর দরজার গড়নও প্রায় একই রকম। বুঝলাম—জগদীশের বাড়ী খুঁজে পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। ধূর্ত্ত সয়তান অন্ধকার এবং দুর্য্যোগের সুযোগ নিয়ে কী শুভ লগ্নেই না আমাকে সংগ্রহ করেছিল!

আরও কিছুক্ষণ ধরে গলিটার এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত পায়চারী করে দুধারের বাড়ীগুলিকে তন্ন তন্ন করে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হোলো অদূরে ওই যে বাড়ীটা—চওড়া সিঁড়ি, দুধারে জানালা, ওই বাড়ীটার মধ্যেই সেদিন প্রবেশ করেছিলাম। নিশ্চয়ই ওই বাড়ী!

দরজা খোলাই ছিল; বাহিরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলাম—বেহারা!

সঙ্গে সঙ্গে একজন শিখ দরওয়ান বেরিয়ে এল। করলাম—বাবু কোথায়?

—বাবু? কোন বাবু? সরকার বাবু?

—না রে বাপু না। এ বাড়ীর যিনি মালিক?

দরওয়ান দাড়ী চুমরে বল্লে—মালিক? কিসকা মাংতা আপ? উসকো নাম বলিয়ে। মহারাণী এ মোকামকে মালিক হই।

ভয়ে ভয়ে বল্লাম—জগদীশ বাবু হ্যায় এ বাড়িমে?

দরওয়ানটা কোন কথা না ব'লে আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। অপ্রস্তুত এবং অপমানিত হ'য়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম; মনে হোলো এমনি ক'রে যদি বারবার বেঠিকানায় গিয়ে হাঁক্ ডাক্ করতে থাকি তাহ'লে কী জানি, হয়ত ভাগ্যে অধিকতর দুর্ভাগ্য ঘটতে পারে। ঠিক করলাম, এমন ক'রে আর লোকের দরজায় দরজায় খোঁজ নিয়ে উপহাসাস্পদ হবো না। অন্য উপায় অবলম্বন করতে হ'বে। কিন্তু কি উপায়?

সাহেবকে গিয়ে নিজের অকৃতকার্য্যের কথা বল্লাম। সাহেব শুনে হেসে বল্লে—গোড়াতেই বলেছিলাম পুলিশে খবর দাও।

কোন কথা বল্লাম না মনের ভিতরে অনুক্ষণ জগদীশ, রহিম এবং ললিতার (বিশেষ ক'রে ললিতার) ছবি ভেসে বেড়াতে লাগল। হাতে অনেক কাজ জমে উঠেছিল। কয়েকদিন ধ'রে নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর রইল না। প্রায় প্রত্যহই বৈকালের দিকে সাহেবের সঙ্গে (এবং একলাও) বারাকপুর যেতে লাগলাম! বড় একটা অর্ডার পাওয়া গিয়েছিল; তারই

মাল সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে মগ্ন হ'য়ে রইলাম। দিন পাঁচ-সাতের মধ্যে তাদের কথা চিন্তা করবার বিশেষ অবসর পেলাম না।

ছয়

সহসা একদিন এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা ঘট্‌লো।

সন্ধ্যা হ'তে তখনও বিলম্ব আছে। ট্রেণ থেকে বারাকপুর ষ্টেশনে নেমেছি। সেদিন একাকী ছিলাম। অন্যদিন চাকরটা থাকে; সেও সেদিন নেই। হাত-ব্যাগটা বাঁহাত থেকে ডান হাতে নিয়ে ষ্টেশন থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে নারীকণ্ঠে আমার নাম ধ'রে কে যেন ডেকে উঠল। চকিত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম।

আমার সম্মুখে স্মিত-মুখে দাঁড়িয়ে আছে— ললিতা!

গোধূলির সেই ম্লায়মান সূর্য্যাস্তরাগে, সেই জনবিরল বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রের পটভূমি সমন্বিত ষ্টেশনের বহির্ভাগে তাকে অপরূপ সুন্দরী দেখাচ্ছিল। যেন কোন শিল্পীর আজন্ম-সাধনার মানস প্রতিমা।

কিন্তু তাকে যে এখানে এমন সময় দেখতে পাব তা আমার সুদূরতম কল্পনারও অতীত ছিল। মুখ দিয়ে বেরুলো—তুমি!

পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি বল্‌লাম—কি আশ্চর্য্য, আপনি এখানে?

ললিতা আমার নিকটে এসে দাঁড়ালো। পশ্চিমাকাশের পতিত স্বর্ণরাগের আভায় তার মুখখানি বুঝি অতখানি রক্তিম হ'য়ে উঠেছে। অপলক দৃষ্টিতে তার সেই রক্ত-রাগ-রঞ্জিত মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম।

ললিতা একবার মুখ তুলে তার দুই আয়ত চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করলে। তারপর মুখ নীচু করে বল্‌লে—কেন, আমি তো প্রায়ই এখানে আসি।

মনে পড়ে গেল, বল্লাম—ও, হাঁ। আপনাদের এখানে একখানা বাড়ী আছে, না? সেই জন্যই।

নিমেষ মধ্যে এই ললিত-তনু মেয়েটির প্রতি অপরিসীম বিরাগে মন পূর্ণ হ'য়ে উঠল, বল্লাম—এবার কিন্তু আর নিমন্ত্রণ করলেও আপনাদের ছায়া মাড়াব না। উঃ, কী ভয়ানক লোক আপনার কাকা! কিন্তু তাঁকে বলবেন যে, সহজে এবার তিনি নিস্তার পাবেন না। এর প্রতিশোধ আমি নেবই—জীবন পণ।

এই ব'লে অগ্রসর হলাম।

কয়েক মুহূর্ত্ত ললিতা নীরব রইল, তারপর পুনরায় আমার নাম ধরে আমায় আহ্বান ক'রলে।

ফিরে দাঁড়ালাম। আমার কাছে স'রে এসে ললিতা বল্লে—বিজয় বাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

দরকার আমার সঙ্গে?

নিজের রুক্ষ কণ্ঠস্বরে নিজেই লজ্জিত বোধ করলাম। দুই চোখে বেদনার সজল আকুতি ভরে অপরাধীর মতো ললিতা বল্লে—এ কদিন ধ'রে আপনাকে প্রায় দেখছিলাম, কখনো একা,

কখনো বা সাহেবের সঙ্গে এখানে আসছেন। রোজই মনে করতাম, আপনাকে ডাক্‌বো ; কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। আজ আপনাকে ডেকে যে অসুবিধায় ফেলাম, তার জন্ত আমায় ক্ষমা করবেন। জানি আমরা আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তার জন্ত যত অপমানই আমায় করুন, সে আমার উপযুক্ত পাওনা। কিন্তু আজ যখন আপনার সঙ্গে এমনভাবে দেখা হোয়ে গেল, তখন আমার যা বক্তব্য দয়া কোরে আপনাকে শুন্‌তে হবে।

এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলে ললিতা হাঁপাতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম ; অপরাধ করেছে এর খুড়া, তার জন্ত একে একাকী পেয়ে লাঞ্ছনায় বিদ্ধ ক'রে আমার কি ইষ্ট লাভ হ'বে।

ললিতার সরল চোখের বেদনা-বিদ্ধ দৃষ্টি আমাকে লজ্জিত করলে।

বললাম—যাক্, যা বলেছি, তার জন্ত আমায় মাপ করবেন। এখন, আপনারি কী কথা বলুন।

দু'জনে ষ্টেশন অতিক্রম ক'রে মাঠের মধ্যে নেমে গিয়ে পায়ে চলার যে পথটী এঁকে বেঁকে বহুদূর পর্য্যন্ত চ'লে গেছে তারই উপর দিয়ে চল্‌ছিলাম।

ক্ষণেক নীরব থেকে মৃদুকণ্ঠে ললিতা বল্লে—প্রথমে আমার এই কথাটী আপনাকে বিশ্বাস করতে হ'বে যে আপনার উপর যে নৃশংস অন্যায় করা হ'য়েছে, তাতে আমার হাত ছিল না। আমি—

—বেশী বল্‌তে হ'বে না আপনাকে। আপনার একথা আমি বিশ্বাস করলাম।

—দ্বিতীয় কথা হ'চ্ছে, যে ঘটনা ঘটেছে, তার কথা আপনি ভুলে যান।

—ভুলে যাব! আপনি বলেন কি? সে ঘটনা আমার মনে চিরদিনের মতো গাঁথা হ'য়ে গেছে। সে কথা ভুলবো না কোন দিন। আমি এর প্রতিশোধ চাই।

ললিতা বল্লে—আমি অনুমান করেছিলাম যে আপনি ঠিক এমনি ভাবেই প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় ক্ষিপ্ত হোয়ে উঠ্‌বেন।...

তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লাম—আচ্ছা, কেন বলুন তো আপনার কাকা আমার সঙ্গে এমন পৈশাচিক ব্যবহার করলেন, কোনদিন তাঁর কোন ক্ষতি তো আমি করিনি!

ললিতা বল্লে—তা আমি জানি নে; কিন্তু এটা ঠিক যে তিনি আপনাকে অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছিলেন। আমি আপনার বিষয় আগেই জান্‌তে পেরেছিলাম; কিন্তু নাম বা ঠিকানা তো জানতে পারি নি, তাহলে আগেই আপনাকে সাবধান কোরে দিতাম।

—ধন্যবাদ! কিন্তু কেন তিনি এভাবে আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করলেন? আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত জানেন। বলুন, আমায় সব কথা প্রকাশ ক'রে বলুন।

ললিতা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বল্লে—আপনাকে আমার অনুরোধ—আপনি এ বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করুন। বলুন আমার এ অনুরোধ রাখবেন।

তার এই অন্যায় অসঙ্গত অনুরোধে সমস্ত অন্তর বিদ্রোহে

তাঁর প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠল। বল্লাম—মাপ করবেন, আপনার অনুরোধ রাখতে পারবো না।

—পারবেন না? ললিতা তার ব্যথিত দুই চোখের কাতর দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করলে।

বল্লাম—না। আপনার কাকার ব্যবহারে আমার মন তিক্ত ও বিষাক্ত হোয়ে রয়েছে। যদি আমায় বন্ধু বোলে স্বীকার করেন তা'হলে, সমস্ত কথা খুলে আমার কাছে প্রকাশ করুন। কোথায় আপনাদের বাড়ী, কখন গেলে আপনার কাকার সঙ্গে দেখা হবে—সব কথা আমায় বলুন।

রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে ললিতা বল্লে—আমার মনের সব কথা আপনাকে শোনাতে আমার যে কত ইচ্ছে, তা যদি আপনি জানতেন! কিন্তু কোন কথাই আপনাকে বলতে পারবো না। আমার নিজের মর্যাদা এবং জীবন রক্ষার জন্য কোন কথাই আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারবো না। আমার মুখ বন্ধ।

উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলাম—তোমার মুখ বন্ধ। কে বন্ধ করেছে? তোমার কাকা?

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে ললিতা বল্লে—হ্যাঁ তিনিই।

বল্লাম—কিন্তু কেন? তিনি তোমার কাকা; নিশ্চয়ই তিনি তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবেন না।

ললিতা বল্লে—অনিষ্ট করতে পারবেন না? আপনি আমার জীবনের কথা জানেন না, তাই ওকথা বলছেন। এক কথায় তিনি আমার জীবনকে ধ্বংস করে ফেলতে পারেন—আমায় চরম অপমানের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারেন।

বল্লাম—তিনি যদি এমনই, তুমিও তো তাহলে এক কথায় তাঁকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারো।

—না, না। সেকাজ করবার সাহস আমার নেই।—ললিতার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক ভীতি প্রকাশ পেল।

বল্লাম—কিন্তু, এতো ভয়ই বা কিসের? হাজার হোলেও তিনি তো তোমার আপনার খুড়ো……

—হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু কারুর যেন আমার মতো ভাগ্য না হয়। আমার মতো আর কে আছে যে তার নিজের জীবনকে নিজের অবস্থাকে এতখানি ঘৃণা করে। আপনি জানেন না। আমার মতো অসুখী এবং অসহায় এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

তার আর্দ্র কণ্ঠস্বর মনের মধ্যে বেদনা জাগিয়ে তুলল। মাঠের উপর দিয়ে দু'জনে ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করছিলাম।

আশে পাশে জন-মানবের সাড়া নেই। মাথার উপর ত্রয়োদশীর ক্ষীণ এক ফালি চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। কী এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির প্রেরণায় দু'জনের অন্তর্লোক যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে!

ক্ষণকাল দু'জনেই চুপচাপ।……

তারপর তার আরও নিকটে সরে গিয়ে কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে বল্লাম—তোমাকে সুখী করবার জন্য আমার জীবনের সমস্তটুকুই তোমাকে নিবেদন করতে পারি। নিজের নিরুপায় অবস্থায় আমাকে যদি কোন কাজে লাগে বোলে মনে কর, তা জানাতে একটুকুও দ্বিধা কোরো না। তোমাকে যদি সাহায্য করতে পারি—সে হবে আমার জীবনের পরমতম কাজ!

ললিতার মুখ দেখতে পেলাম না ; কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য এড়াল না ; কোমল কণ্ঠ রুদ্ধ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে—যেন অনাহত সঙ্গীত—যন্ত্রের তারে প্রথম অঙ্গুলি পরশ লেগেছে ; বল্লে—আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে। এমন কোরে কেউ কখনো আমায় সান্ত্বনা দিয়ে কথা বলে নি। ছোট বেলায় মায়ের মুখের কথা শুনেছি—দুঃখের সময় সেই ছিল আমার সান্ত্বনা। আজ আপনার কথাও আমার মনে গাঁথা হোয়ে রৈল।

কথা বলবার তার একটি সহজ ক্ষমতা আছে। তার প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি ভঙ্গী এবং সর্ব্ব সময়ের ব্যবহারের ভিতর এমন একটি মাদকতাপূর্ণ শ্রী থাকে তা যেমন সুন্দর তেমন সুদূর। তাকে একান্ত নিকটে নিয়ে পথ চলছি, কিন্তু তবুও যেন মনে হচ্ছে—সে কোন অনতিগম্য রাজ্যের অধিবাসী, যেখানে পৌঁছানো আমার সাধ্যাতীত।

অনেক বার অনেক প্রকারে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তাদের বালিগঞ্জের রহস্যময় বাড়ীর কোন কথাই সে প্রকাশ করলে না। বল্লাম—এ কিন্তু তোমার অন্যায়। আমি এমন একজন লোকের হাতে পড়লাম যে নৃশংস, যে হত্যাকারী। তাকে পুলিশের হাতে অর্পণ করাই কর্ত্তব্য। এবং আমি তা করবই

ললিতা বল্লে—এবং সেই সঙ্গে আমাকেও আত্মঘাতী করবেন। কারণ কাকাকে ধরিয়ে দিলেই তিনি আমার কথা প্রকাশ কোরে দেবেন এবং তখন আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না।

মহা সমস্যায় পড়লাম। বল্লাম—কিন্তু এমনি কোরে তোমার কাকা যদি শাস্তি এড়িয়ে যায় তা হলে আরও কত লোকেরই যে সর্ব্বনাশ করবেন তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। আমার আগে যে মেয়েটি প্রাণ হারিয়ে সে-ঘরের মধ্যে পড়ে' আছে তার কথা একবার ভাব দেখি!

আমার শেষ কথাটা শুনে ললিতা ভীষণ চম্‌কে উঠল; বল্লে—মেয়ে, কে মেয়ে?

বল্লাম—কে, তা কেমন কোরে জানবো! তাকে স্পর্শ কোরে দেখলাম, অনেকক্ষণ সে মরে গেছে। গলায় তার একটী লম্বা চেন হার, তাতে একটি মাদুলী বাঁধা—

ললিতা আর্ত্তস্বরে বলে উঠল—মাদুলী! কখ্‌খনো না। হতেই পারে না।......

বিস্মিত হলাম।—হোতে পারে না মানে? আমি যে নিজে দেখলাম, একটি বড় গোছের মাদুলী তার গলায় রয়েছে! তুমি কি মেয়েটিকে চেন?

ললিতা নীরব হ'য়ে রইল। আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলাম।...শেষে সে বল্লে—হ্যাঁ, চিনি।

—কে, সে? কোথায় থাক্‌তো? তোমার বন্ধু?

সে বল্লে—হ্যাঁ, আমার বন্ধু। তার নাম—করুণা। করুণা গাঙ্গুলী। তারা শ্যামবাজারে ১৫৩ নম্বর মোহনলাল ষ্ট্রীটে থাকে। আহা বেচারী!

ললিতার দু-চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

বল্লাম—তা হোলেই বুঝে দেখ তোমার কাকা কি ভীষণ

লোক ! তুমি বল ললিতা, কেমন কোরে আমি সে বাড়ী খুঁজে পাবো। আমায় সব কথা তুমি প্রকাশ কোরে বল।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে ললিতা বলে—সব কথা আপনাকে বলতে আমার যে কত ইচ্ছে, তা যদি আপনি জানতেন ! কিন্তু আমি বলতে পারব না। আপনি আমায় জিগ্যেস করবেন না।

মেয়েটির অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রতি অপরিসীম সহানুভূতিতে হৃদয় ভরে উঠল। বল্লাম—বেশ, আর কখনো তোমায় কোন প্রশ্ন করবো না। তুমি শান্ত হও। তোমাকে স্পর্শ কোরে এই আমি শপথ করছি, যদি স্বেচ্ছায় কোনদিন বল তবেই শুনবো, তা না হ'লে কোনদিন এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন কোরে আর তোমাকে উৎপীড়িত করব না।

আমার কথা শুনে ললিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—আপনাকে কী বোল্‌লে যে অন্তরের ধন্যবাদ জানাবো—

তার কথা শেষ হবার আগেই তার দু'হাত ধরে তাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে বল্লাম—ধন্যবাদের দরকার নেই। কিন্তু আজ এইখানে দাঁড়িয়ে আকাশের তারাদের সাক্ষী কোরে বল, আজকের এই সব দুর্বিপাক কেটে যাবার পর যদি তোমার কাছে আমার অন্তরের প্রার্থনা জানাই, তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করবে না।

আমার সবল দু'হাতের মধ্যে তার ক্ষীণ হাত দু'খানি কেঁপে উঠল। বল্লাম—নীরবতা তোমায় ভাঙতে হ'বে। তোমার মুখের কথা আমি শুনতে চাই—বল।

ললিতা অস্ফুট স্বরে কী বলতে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে সবলে আমার গলা টিপে ধরলে।…

সহসা এ কী হ'ল! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার দম্ বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগল। বুঝলাম, যে আমাকে আক্রমণ করেছে, সে ব্যক্তি অসীম শক্তির অধিকারী। আমার রক্ষা নেই।

সাত

ললিতা চীৎকার কোরে উঠল। তারপর আমার আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে লাগল :—

—ছেড়ে দাও ওঁকে। ছেড়ে দাও বলছি, রহিম! রহিম!

এতক্ষণে বুঝলাম, কে আমাকে এরূপ অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। বুঝতে পেরে আমার দেহ অসাড় হ'য়ে এল। হাত পা নাড়বার ক্ষমতা লুপ্ত হল। বুঝলাম, সে-বার যদিও বা কোন প্রকারে নিস্তার পেয়েছিলাম, এবার আর পরিত্রাণ নেই।…কণ্ঠনালীর উপর দুর্বৃত্তের আঙ্গুলগুলো ক্রমশঃ অধিকতর চেপে বসছে।…আজ বুঝি তার হাতেই আমার এ জীবনের শেষ!

পিছনে ধস্তাধস্তির শব্দ পাচ্ছিলাম। ললিতা রহিমকে ছাড়াবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছে।…কয়েক মুহূর্ত্ত পরে শব্দ থেমে গেল। তারপরেই এক অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটল।

সহসা সেই নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করে একটা চাপা আওয়াজ

হলো—পিস্তলের শব্দ। পরক্ষণেই আমার গলার উপর থেকে রহিমের দুই হাত শিথিল হ'য়ে এল এবং আমি তাকে ধাক্কা দিতেই সে টলে মাটির উপর পড়ে গেল।

ললিতা হাতের বন্দুকটি রহিমের গায়ের উপর ফেলে দিয়ে চাপা কণ্ঠে বল্লে—এ আমি কি করলাম! মানুষ খুন করলাম—

সে কাঁপছিল। তাকে নিজের কাছে টেনে এনে বল্লাম—কিছু অন্যায় করো নি তুমি। ঠিক করেছো। কিন্তু পিস্তল কোথায় পেলে?

নিজের রিভলভারটি বাড়ীতে রেখে এসেছিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ভবিষ্যতে তাকে ছাড়া এক পাও চলবো না।

ললিতা বল্লে—ওর জামার পকেটে ছিল। বার কোরে নিয়েছিলাম।

—ভাগ্যিস নিয়েছিলে—তাই তো আমার প্রাণ রক্ষা হলো।

—কিন্তু আমার কী হবে? কাকা জানতে পারলে, আমার আর রক্ষে থাকবে না। রহিমকে মেরে ফেলেছি জানলে উনি তক্ষুণি আমায় শেষ করবেন। রহিমকে না হোলে ওর যে কোন কাজই হয় না।

বললাম—এ ভালই হল যে রহিমকে দিয়ে ভবিষ্যতে ওর কোন কাজই আর হবে না। কিন্তু সে কথা থাক। এখন তোমায় ভালোয় ভালোয় বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে। তোমার কাকা কোথায়?

—কাকা এইখানেই আছেন। ওই যে দূরে ওদের জানালায় আলো জ্বলছে—ওটি আমাদের বাগান-বাড়ী। বাড়ী কোথায় যাবো—সেখানে আর আমার স্থান নেই!

বললাম—তবে চলো আমার সঙ্গে।

—আপনার সঙ্গে? কোথায়?

তার এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম—আমাকে তুমি বিশ্বাস করো ললিতা?

সহসা আমার এই প্রশ্নে সে থতমত খেয়ে গেল। আমার পানে চোখ মেলে বললে—হ্যাঁ, আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

—বাস্! তাহলে কোথায় যাবে সে প্রশ্ন আর কোরো না। জেনে রাখো, তোমাকে তোমার কাকার ক্রোধ থেকে বাঁচাবার জন্যে আজ থেকে আমার সমস্ত জীবন নিয়োজিত রৈল। প্রথমে, তোমাকে আমার এক পরিচিত বোর্ডিং-এ রাখবো। সেখানে তোমার কোন অসুবিধা হ'বে না। বড় বোর্ডিং। মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা আছে। তারপর, এ দুর্যোগ কাটলে, তোমায় আমার বাড়ী নিয়ে যাব—আমার অনেক-সাধনা-কোরে পাওয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে। কেমন রাজী তো?

ললিতা কোন কথা বললে না ধীরে ধীরে তার অশ্রুসজল মুখখানি আমার বুকের উপর স্থাপন করলে।

* * * *

"ভারত-আশ্রমে" ঘর নিয়ে তাকে বাসোপযোগী ক'রে

উঠিয়ে তুলতে দিন চারেক কেটে গেল। সেই দীর্ঘ চারদিন যে কেমন কোরে কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা জানতে পারলাম না। নব-দম্পতীর মধু-চন্দ্রিমার মধ্যে আমাদের মোহভরা মুহূর্ত্তগুলি দুজনের জীবনে যে ইন্দ্রজাল স্বজন করলে, তা যেমনি অনির্ব্বচনীয় তেমনি প্রাণময়! ললিতার মুখে অনুক্ষণ একটি ব্রীড়ারঞ্জিত আভা লেগে থাকে। আমাদের এই অপ্রশস্ত বাঙালী-জীবনে পূর্ব্বরাগের এমন রোমাঞ্চময় রোমান্স সচরাচর কারো ভাগ্যে ঘটে না —এই কথাটি মনে করে ক্ষণে ক্ষণে গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছিলাম।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইংরেজী বাংলা খবরের কাগজ পড়ছিলাম, কিন্তু, কী আশ্চর্য্য, রহিমের কোন সংবাদই পেলাম না। ললিতার কথাই ঠিক হ'ল। নিশ্চয়ই বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে জগদীশবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তারপর রহিমকে দেখতে পেয়ে তার লাশ সরিয়ে ফেলেন।

* * * *

তিন চার দিন পরে সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে সকল কথা বললাম। সাহেব শুনে একগাল হেসে রসিকতা করলে :

—তবে আর কী, যখন মনের মত গার্ল্ পেয়েছ তখন আর অত হাঙ্গামায় কাজ কী?

বল্লাম—হাঙ্গামা করতে চাই ভবিষ্যতের দিনগুলো কণ্টকশূন্য করতে। এই রহস্যময় ব্যাপারের শেষ না করে আমার শান্তি নেই। যাই হোক্, আজ গুড্ ডে। ক'দিন যদি না আসতে পারি—কাজ চালিয়ে নিও।

সাহেব বল্লে—কিন্তু যেদিন আসবে সেদিন যেন মিসেস গুপ্ত এবং বিবাহের প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ সঙ্গে থাকে।

বল্লাম—দেখা যাক্। এখন তোমার বরাৎ এবং আমার হাত-যশ।

সাহেব বল্লে—নিজের সেই শুভপত্রের বরাৎ কামনা করি; এবং তোমারও।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করলাম।

*　　　*　　　*

সোজাসুজি করুণা গাঙ্গুলীদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। করুণার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো। প্রবীন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক। অতিশয় অমায়িক এবং সদানন্দ পুরুষ। বিষয়ের আলাপ আলোচনার পর বললেন—করুণাকে খুঁজছেন? কিন্তু সে তো বাড়ী নেই। তাকে তো আমরাও সবাই খুঁজছি। তার জন্ম বড্ড ভাবনায় পড়েছি। (তাঁর সদা প্রফুল্ল মুখের উপর শঙ্কার ঘন ছায়া ফুটে উঠল।) আজ চারদিন হ'ল সে বাড়ী আসে নি। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলছে। কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না তো। বড়ই ভাবনায় পড়েছি। এ রকম তো কখনো হয় না। যা ওর দেরী হয় সে ললিতার সঙ্গে ওদের বাড়ী গিয়ে, তাছাড়া…

বললাম—যাঁর কথা বললেন, তিনি কে?

আমার উত্তরে করুণার পিতা বললেন—সে হো'লো করুণার বন্ধু—most intimate friend…

বললাম—তাঁদের বাড়ী খোঁজ করেছেন? তাঁদের বাড়ী কোথায়?

করুণার পিতা বললেন—আগে তাদের বাড়ী ছিল গড়পারে। বছর খানেক হোলো তারা বালিগঞ্জে উঠে এসেছে। ললিতার কাকা শুনেছি একজন মস্ত পণ্ডিত।

মনে মনে বললাম—পণ্ডিত যে কত বড় তা' আমি জানি। প্রকাশ্যে বললাম—ললিতা বুঝি আপনাদের এখানে প্রায়ই আসতো।

—হ্যাঁ, তা আসতো বৈ কী! গড়পারে যখন থাকতো, তখন মোহিতের সঙ্গে প্রায় রোজই বিকালে আমাদের এখানে আসতো। মেয়েটী খুব ভাল।

—মোহিত কে? তাকে তো চিন্‌লাম না।

—মোহিত? মোহিত হোলো জগদীশ বাবুর ছাত্র? চমৎকার ছেলেটী। ওর সঙ্গে ললিতার বিবাহ ঠিক হোয়েছিল।

চম্‌কে উঠে প্রশ্ন কর্‌লাম—তাই নাকি? তা' হোলে না কেন?

তিনি গম্ভীর হোয়ে বললেন—তা তো বলতে পারিনে। সে হোলো ওঁদের ঘরোয়া কথা। সে কথা জানবার জন্ত…

বললাম—তা' তো বটেই। আচ্ছা এই মোহিত কোথায় থাকে জানেন?

—তা আর জাননে? মোহিত হোলো ডাক্তা চন্দ্র মাধব-এর ছেলে। ওদের বাড়ীটা হোলো আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে; নম্বরটা—

বললাম—থাক্। তাড়াতাড়ি নেই। নম্বর পরে জান্‌লেই চলবে না। আজ উঠি। নমস্কার।

টেলিফোন-গাইড্ থেকে ডাক্তার সরকারের ঠিকানা নিয়ে পরদিন প্রাতে তাঁর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে মোহিত বেরিয়ে এলো। সুন্দর সুশ্রী চেহারা। সুডৌল ললাটের উপর আভিজাত্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। দেখে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হলাম।

তার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথাবার্ত্তা আছে শুনে সে বিস্ময়ান্বিত হোলো। বল্লে—বেশ, তাহ'লে চলুন লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসি। এখানটায় বাবার পেশেণ্ট এবং যাবতীয় বাইরের লোক এসে এখুনি ভীড় করবে।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে, দু'জনে একটি ছোট টেবিলের দু'ধারে মুখোমুখি বসলাম। কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর বললাম—দেখুন, আমি আপনার কাছে একজনের বিষয় জান্তে এসেছি। তিনি একটী মহিলা। তার জন্মেই প্রথমটা এত সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই ললিতা সেন নামে একটি মেয়েকে জানেন ?

—সে খোঁজে আপনার আবশ্যক ?...মুহূর্ত্ত মধ্যে মোহিত গম্ভীর হ'য়ে উঠল।

—সম্প্রতি একটু আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। আমি তার সম্বন্ধে এবং তার খুড়োর সম্বন্ধে কোন গুরুতর ব্যাপারের জন্য অনুসন্ধান করছি।

—ওঃ, আপনি তাহ'লে একজন টিক্‌টিকি। তাই বলুন !

বল্লাম—আপনার অনুমান ভুল। টিক্‌টিকি-গিরি চোদ্দ-

পুরুষে আমার কেউ করে নি! তবে, এই ললিতা সেন এবং তার খুড়োর সম্বন্ধে বাধ্য হোয়ে আমায় খোঁজ নিতে হচ্ছে। তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার আলাপ আছে এবং সে-আলাপের অভিজ্ঞতাও আপনার নিশ্চয়ই খুব প্রীতি-পদ নয়। আমি তা' জানি। এবং জানি বলেই আজ আপনার কাছে তাদের সম্বন্ধে জানতে এসেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন; আপনাকে কোন অসুবিধের মধ্যে ফেলতে চাইনে আমি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মোহিত যখন বুঝলে যে, সত্যই আমি পুলিশের লোক নই এবং যাদের বিষয় অবগত হ'তে এসেছি, আমি তাদের দলের লোকও নই, তখন সে অনেকটা আশ্বস্ত হোলো। বল্লে—ওরা বড় ভয়ানক লোক মশায়। বিশেষ করে ওই মেয়েটি···একেবারে সাঙ্ঘাতিক।

বল্লাম—সেই সব জানতেই তো আপনার কাছে আসা।

মোহিত সহসা প্রশ্ন করলে—আপনি প্রথমে বলুন তো কেন আপনি তাদের সম্বন্ধে জানতে চান, এবং আমার খবরই বা কোত্থেকে পেলেন—তারপর আমি সব কথা বলব।

বাধ্য হয়ে মোহিতের কাছে সব কথা প্রকাশ করে বল্লাম। কেমন কোরে বালিগঞ্জের পথে রোরুদ্যমান মেয়েটিকে দেখেছিলাম কেমন কোরে তাদের বাড়ী গেলাম, সেখানে কী ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে কেমন কোরে অজানিত উপায়ে উদ্ধার পেলাম, সমস্ত কথা তাকে বল্লাম; শুধু বল্লাম না তার পরের ঘটনাগুলি বল্লাম না আমার সহিত ললিতার বর্ত্তমান সম্বন্ধের কথা।

সকল কাহিনী শুনে মোহিত যারপরনাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বল্লে—উঃ! কী ভীষণ? যাক্, আমি খুব বেঁচে গেছি; আর কিছুদিন ওদের ওখানে যাতায়াত করলে, হয়ত আমারও এই রকম অবস্থা হোতো।

প্রশ্ন করলাম—আপনি কী ওদের বালিগঞ্জের বাড়ী একবারও যান নি?

—না, তা আর কই গেলাম। গড়পারে থাকবার সময়েই ওদের সঙ্গে আমার আলাপের সুরু এবং শেষ। কিন্তু যাই বলুন, আমার মনে হয়, খুড়োর এই সব কাজে ভাইঝিটিরও যোগ আছে। আপনি চমকে উঠলেন! জগদীশও ভীষণ লোক, লোকটার বাড়ী খুঁজে বার কোরে তাকে পুলিশে দিতে চান, দিন। কিন্তু, সাবধান মশাই, ললিতার সঙ্গে বেশী মিশবেন না। খবরদার, খবরদার।

বল্লাম—কেন বলুন তো? আমার তো ও:কে ভালই লাগে!

মোহিত হাসল, বল্লে—ওই তো মজা! ওর রূপ দেখে আমাব ওকে ভাল লেগেছিল। প্রায় ওর প্রেমে পড়েছিলাম বললেও চলে।

—তারপর?

—তারপরের কথা আর নাই বা শুনলেন। সে-সব কথা আপনার হয়ত বিশ্বাসই হবে না।

—বিশ্বাস হবে না! আপনি বলেন কী! আপনার কথা বিশ্বাস করব না তো কার কথা বিশ্বাস করব। আপনি বলুন

—বলব আর কী ? আচ্ছা, কিছুদিন আগে গড়পার অঞ্চলে হরিদাস রায় বলে একটি লোকের মৃতদেহ রহস্যজনক ভাবে পথের উপর পাওয়া গিয়েছিল।—সে কথা আপনি শুনেছেন ?

বললাম—শুনেছিলাম যেন। পুলিশ তদন্ত ক'রে কিছুই বার করতে পারলে না। রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেই লোকটা কোথায় খুন হয়েছিল জানেন ? জগদীশ বাবুর বাড়ীতে।

—বলেন কী ?

মোহিত বললে—তখন আমি প্রায়ই সন্ধ্যার পর ললিতার সঙ্গে ওদের বাড়ী যেতাম। একদিন ওর সঙ্গে সন্ধ্যার সময় ওদের বাড়ী গিয়ে দেখি—সামনের ঘরে হরিদাস ব'সে আছে। হরিদাস ছিল আর্টিষ্ট। জগদীশ বাবুর কাছে কী সব ছবি আঁকার কাজ করত। এবং সেই জন্য প্রত্যহ অনেক সময়েই সে ওদের বাড়ী থাকতো। আমাদের দুজনকে দেখেই হরিদাসের মুখখানা ভীমরুলের চাকের মতো হো'য়ে উঠলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বললে—ললিতা, একবার শুনে যাও।

—তাকে ডাকতেই, ললিতা তার পিছু পিছু পাশের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হরিদাস দরজাটা বন্ধ কোরে দিলে আমি তো অবাক। অনেক দিন থেকেই হরিদাসকে দেখে আমার সন্দেহ হোতো; আজকে নিশ্চয় বুঝতে পারলাম—হরিদাস ললিতার প্রেমিক। আমাকে ও সন্দেহ করে এবং সেইজন্যই ললিতার ওপর রেগে উঠেছে।

—হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে চীৎকার শোনা গেল—এক্ষুনি

কোরে আমার সঙ্গে প্রতারণা করা। আচ্ছা এর ফল পাবে। উৎকর্ণ হোয়ে উঠলাম। আর হরিদাসের গলা শোনা গেল—না, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় ওই লোকটা তোমার প্রেমিক। বেশ ব্যবসা শুরু কোরেছ যা-হোক! প্রথমে আমাকে মজিয়ে, এখন দিব্বি ওর সঙ্গে—

—দেখুন, মুখ সামলে কথা বলবেন, বলছি। আমার কাকা আপনার টাকা ধারেন, সত্যি। কিন্তু এ-অপমান তা ব'লে আমি সহ্য করব না···বুঝলাম এ ললিতার গলা।

—আবার হরিদাসের গলা: তবে কেন তুমি আমায় আশা দিয়েছিলে? আমাকে ছেড়ে এখন কেনই বা ওকে ভালবেসেছো।

ললিতা বললে: না, আমি ওকে ভালবাসি না। আর আপনাকেও আমি কোন আশা দিই নি। আপনাকে আমি ঘৃণা করি।

হরিদাস বললে—আশা দাওনি? মিথ্যাবাদী। ঘৃণা করো? আচ্ছা. এর ফল পাবে। জানো, আমি তোমাদের সব কথাই জানি। এই মুহূর্ত্তে তোমার কাকাকে জেলে দিতে পারি। আশা দাওনি তুমি আমায়? তুমি না দাও, তোমার কাকা দিয়েছে। তাহ'লে বল, তোমার খুড়ো তোমাকে দিয়ে ব্যবসা খুলেছে।

একটু থেমে মোহিত পুনরায় বলতে আরম্ভ করলে—ভিতরে এই সব কথা চলছে, এমন সময় হঠাৎ বাড়ীর সবগুলো আলো একসঙ্গে নিভে গেল! ঘোর অন্ধকার। মহা মুস্কিলে পড়লাম।

ললিতার নাম ধরে ডাক্‌তে যাবো এমন সময় ঘরের ভিতর একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। কে যেন কাকে কী ছুঁড়ে মারলে, এবং সে "উঃ" বলে আর্ত্তনাদ কোরে উঠ্‌লো। মনে হ'লো যেন হরিদাসের গলা। তারপরেই একজন দড়াম কোরে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর সব চুপ। এক মিনিট, দুমিনিট, পাঁচ মিনিট কেটে গেল……ঘরের মধ্যে কোন শব্দ নেই। অনেক কোরে ললিতাকে ডাকাডাকি করলাম, কোন উত্তর পেলাম না। তারপর কী কষ্টে যে সেই অন্ধকার হাতড়ে বাড়ীর বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, সে কথা বর্ণনা কোরে বোঝাতে পারবো না আপনাকে। পরের দিন সকালে উঠে খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম, যা ভেবেছি, ঠিক তাই। ললিতার বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তায় হরিদাসের মৃত দেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ তদন্ত করছে। সেই দিনই বিকেলে খবর নিয়ে জান্‌তে পারলাম— জগদীশবাবু সে বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন। কোথায় যে উঠে গেছেন, তার কোন পাত্তা নেই।

প্রশ্ন করলাম—হরিদাস খুন হওয়া সম্বন্ধে আপনি কি বোল্‌তে চান ?

—কী বলতে চাই ? বোল্‌তে চাই যে, সে রাত্রে ললিতাই তাকে খুন কোরেছিল। ললিতার কাকা সেদিন বাড়ীতেই ছিল না। চাকর বাকর গুলো পর্য্যন্ত বেরিয়ে গিছ্‌ল। সুতরাং ও ছাড়া আর কেউ হরিদাসকে খুন করেনি।

—এসব কথা আপনি পুলিশকে বলেন নি কেন ?

—পাগল হয়েছেন ? ব'লে ফ্যাসাদ বাধাই আর কি !

পুলিশ-আর-ঘর করতে-করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোয়ে উঠতো তাহ'লে। আজ নেহাৎ আপনি এসে অনুরোধ করলেন, আর দেখলাম, আপনি অনেক কিছুই জানেন, তাই আপনার কাছে বললাম।

—সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, পরে আপনার সঙ্গে ললিতার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।

—হ্যাঁ হোয়েছে বৈ কী! কিন্তু কী তুখোড় মেয়ে! যেন কিছুই জানেনা—এমনি ভাব। ওর সঙ্গে দেখা হ'লে, এখন আর আমি কথা বলি না।

বললাম—বেশ করেন। অতি খারাপ মেয়ে। খুনে।

আরও কিছুক্ষণ উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করবার পর বললাম—আচ্ছা, এখন আমি উঠি। নমস্কার!

আট

পথ চল্‌তে চল্‌তে মনে হো'লো—এই জন্যেই ললিতার এতখানি শঙ্কা, এতখানি গোপনতা।

সমস্ত মন বেদনায়, বিরূপতায় বিদীর্ণ হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল।

কিন্তু এমন তো নাও হ'তে পারে। হয়ত, হরিদাসকে সত্যিই ললিতা খুন করে নি। কিন্তু সে-ঘরে তো আর কেউই ছিল না! এমন কি জগদীশ বাবু পর্য্যন্ত সেদিন কলকাতায় ছিলেন না, তার নিঃসংশয় প্রমাণ মোহিত প্রদান করেছে!

[illegible] কিন্তু এমনও তো হোতে পারে যে, খুন করবার উদ্দেশ্য ললিতার আদৌ ছিল না, শুধু তার নির্যাতন অপচেষ্টার প্রতিবিধানের হঠকারিতায় ওইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

যাই হো'ক, মনের মধ্যে অতিশয় অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম।

সোজা বাড়ী চলে এলাম।

স্নান-আহার শেষ করে বিশ্রামের আয়োজন করছি এমন সময় খবর পেলাম, আমাকে এক ভদ্রলোক খুঁজছেন, অত্যন্ত জরুরী দরকার।

কে আবার এমন সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো! ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এলাম।

আগন্তুক আমার অপরিচিত। নমস্কার ক'রে বললে—নিরিবিলি আপনার সঙ্গে দু-একটা বিষয়ের আলোচনা করতে চাই।

বললাম—বেশ বলুন। এখানে অন্য কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই।

ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করতে লাগল। বুঝলাম, কেমন করে তাঁর কথা সুরু করবেন, তা ভেবে ঠিক করতে পারছেন না।

প্রশ্ন করলাম—আপনি কোত্থেকে আসছেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

তিনি বললেন—আমি আসছি লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে।

—আপনি ডিটেক্‌টিভ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু আমার ঘরে বোমার কারখানা আছে বলে তো আমি জানিনে। তবে হ্যাঁ, আপনারা আমার চেয়ে নিশ্চয় বেশী জানবেন। তা'হলে কী থানা তল্লাস—

পুলিশ-কর্মচারিটি হেসে বললেন—আপাততঃ থানাতল্লাস নাই বা করলাম। আর বোমার তল্লাসেই যে এসেছি তাই বা আপনাকে কে বললে?

বললাম—বাঁচা গেল। এখন আপনার শুভাগমনের হেতু জানতে পারি কি!

—তা নিশ্চয়ই পারবেন। যখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তখন কেন এসেছি, তা নিশ্চয় আপনার জানা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু গোড়া থেকে আপনি রেগে উঠবেন না, তাতে কোরে আপনার সঙ্গে আলোচনার অত্যন্ত অসুবিধে হবে। আমি আপনার কাছে এসেছি বন্ধুভাবে আপনার সঙ্গে একটা জটিল কেসের পরামর্শ নিতে এবং আপনার সাহায্য প্রার্থনা করতে। আশা করি বিমুখ করবেন না।

ক্রমশঃ যেন আলো দেখতে পাচ্ছিলাম।

বললাম—আর একটু বিশদ ক'রে না বললে তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।

—বলি।—বলে ডিটেক্‌টিভ্ মহাশয় একটি চুরুট ধরালেন। তারপর সুরু করলেন :

—প্রায় বছর খানেক ধ'রে একটা মিস্টিরিয়াস্ কেস্ হাতে

পেয়েছি ; কিন্তু কিছুতেই তার কিনারা কর্তে পার্তে পাচ্ছি নে। আচ্ছা, গড়পারের হরিদাস রায়কে আপনি চিন্তেন?

বললাম—মোটেই না।

—গত বছর তিনি খুন হোয়ে রাস্তায় পড়ে থাকেন। অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার। সেই কেসের তদন্তের ভার পড়ে আমার ওপর। দিন রাত জ্ঞান করি নি মশায়, কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। শুধু এইটুকু খবর পেলাম, একটি লোক, যিনি ঐ অঞ্চলে থাকতেন, তিনি হঠাৎ বাসা বদল কোরে বালিগঞ্জের ষ্টেশনের কাছে উঠে এসেছেন—এবং লোকটির চাল-চলন অতিশয় রহস্যময়। খবর নিয়ে জান্‌লাম—তাঁর একটি মেয়ে আছে। এবং একখানি বেগুণে-রঙের মোটর গাড়ী আছে, যেখানা বেশী সময় গ্যারেজেই বন্ধ থাকে। হঠাৎ কিছুদিন হোলো হুকুম হয়েছে সেই লোকটি এবং তাঁর মেয়ের উপর নজর রাখতে হ'বে।

বললাম—কিন্তু তার জন্মে আমার কাছে কেন?

—বলছি। আগে বলি, কেন ও-রকম হুকুম হোল, তারপর আপনি নিজেই বুঝবেন কেন আপনার কাছে এলাম। ওপর-ওয়ালাদের হুকুম মত অনুসন্ধান কোরে জানা গেল, সেই বেগুন রঙের মোটরে কোরে একদিন রাত্রে একজন লোকের অর্দ্ধমৃত দেহ বহন ক'রে লেকের ধারে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। লোকটি বেঁচে ওঠে। যে-ডাক্তারখানায় তাকে পুলিশ নিয়ে গিছল শুশ্রূষার জন্মে সেখান থেকেই ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পাওয়া যায়। বুকপকেটের মধ্যে কার্ডে লেখা ছিল। তারপর

ভদ্র লোকটির ওপর নজর রাখা হল। কিন্তু সেই বেগুন-রঙের মোটর কিম্বা তার মালিককে পরদিন থেকে অনেক তল্লাস কোরেও খুঁজে পাওয়া গেল না। অনেক প্রকারে তাঁর বাড়ী সন্ধান করা হোল—রাস্তাও খুঁজে পাওয়া গেল—কিন্তু বাড়ীটি কিছুতেই বার করা যাচ্ছে না। এদিকে এ-ভদ্রলোকটির উপর নজর রাখতে গিয়ে দেখা গেল যে, তিনি প্রায়ই বারাকপুর যাতায়াত করেন; এবং এ-ও খবর পাওয়া গেল যে, বারাকপুর ষ্টেশনে জগদীশ সেনের মেয়েকেও প্রায় দেখা যায়। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হ'বে না যে তাঁর সঙ্গে ভদ্রলোকটির নিশ্চয়ই কোন না কোন দিন দেখা-সাক্ষাৎ হোয়েছিল। হঠাৎ তিনচারদিন হোল, জগদীশ সেনের মেয়েরও আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। জগদীশ বাবুরও না। প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে। মনে হচ্ছে যেন—এই বাপ এবং মেয়ের সঙ্গে গড়পাড় হত্যা-রহস্যের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। জগদীশ সেনের সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করে এইটুকু মাত্র জেনেছি যে, লোকটা অত্যন্ত খেয়ালী এবং ভারী পণ্ডিত। মনে হয়, তাঁর মেয়ের সঙ্গে যদি দেখা করতে পারি তা'হলে আমাদের অনেকটা উপকার হ'বে। বর্ত্তমানে তাঁকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আপনারই শরণ নিলাম।

এই অবধি বলে ভদ্রলোক নীরব হলেন। বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। কী সাংঘাতিক ধূর্ত্ত লোক এরা! জানতে আর বাকী কিছু রাখে নি! মনে মনে এই ভেবে আনন্দিত হলাম যে, সব সত্ত্বেও এরা ললিতার বর্ত্তমান ঠিকানা জানে না

এবং সেদিনের সেই রহিম-সংক্রান্ত ঘটনার কথাও শোনেন নি। বাঁচলাম।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললাম—এরপর আর আপনার কাছে কোন কথাই গোপন করা উচিত হ'বে না। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারই আপনার কাছে খুলে বলছি। প্রথমে বলে রাখি, যে-মেয়েটির কথা বলছেন তিনি জগদীশ বাবুর মেয়ে ন'ন—ভাইঝি।

এই বলে কিছু বাদসাদ দিয়ে সমস্ত কথাই খুলে বললাম।

আমার কথা শুনে নকুড় বাবু (পুলিশ কর্মচারিটির নাম নকুড় মিত্র) বললেন—যাক, অবশেষে যে আপনার দেখা পেলাম, সে আমার পরম সৌভাগ্য। এইবার নিশ্চয় এর কিনারা করতে পারব। জানেন বিজয় বাবু, এই কেসটায় যদি সাকসেস-ফুল হোতে পারি, প্রমোশান অনিবার্য্য।

বললাম—আমার দ্বারা যা হোতে পারে, আমি তা করব; আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি বিশেষ সুখী হব।

—ধন্যবাদ। দেখুন, তাহলে এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, জগদীশ-এর বাড়ীটা খুঁজে বের করা। তা হ'লেই অনেক রহস্য জল হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আমার বিমত নেই শুনে তিনি উৎসাহিত হোয়ে উঠলেন :

—আপনাকে, আমার চাই। ব্যাস! আর কারুকে না। দেখবো, হরেন ঘোষের চাল ভাঙতে পারি কিনা! মশায়, ষোট বছরের আমার সিনিয়র, বলে কিনা, এ সব কেস

হাতে নেবার আগে ওর কাছে আমার শিক্ষানবিশী করা উচিৎ!

বল্লাম—ভারী অন্যায়। তারপর? কী করা যাবে—তাই এখন বলুন।

—বলি। দেখুন; কিছু দিন থেকে চিত্তরঞ্জন লেনের মোড়ে রোজ সন্ধ্যার সময় আমি দাঁড়াতাম। দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, জগদীশ-এর বাড়ীটা খুঁজে বার করা। দ্বিতীয়, তার এবং তার ভাইঝির ওপর লক্ষ্য রাখা। তাদের আজ একদিনও দেখতে পাইনি, কিন্তু অনেক দিন ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে একটা বাড়ী ঠিক করেছি; মনে হয়, সেই বাড়ীতেই তারা থাকে। কিসে মনে হোল? তাও বলছি। প্রথমতঃ বাড়ীটার দরজা সব সময়েই বন্ধ থাকে; তাছাড়া, বাড়ীর চাকর-বাকরদেরই খালি ঢুকতে বেরুতে দেখি। বাসিন্দারা থাকে কোথায়? অত বড় একখানা বাড়ী; নিশ্চয় তার মধ্যে লোকজন থাকে। আশে-পাশের অনেক বাড়ীই তো লক্ষ্য করে দেখছি, বাড়ীর কর্তারা আসছে বেরুচ্ছে, নানা রকম লোকজন যাতায়াত করছে। এ বাড়ীর কিন্তু তা না। সব সময়েই দরজা বন্ধ। সময় সময়ে যা-ও বা দরজা খুললো—বেরুলো কে, না চাকর, কিম্বা হয়ত দরওয়ান! ব্যস, এই দুজন। সমস্ত বাড়ীটা অসাধারণ নিস্তব্ধ—যেন ভূতের বাড়ী। কেবল মধ্যে মধ্যে রাত্তিরে ওপরের ঘরের ভিতরে থেকে থেকে দপ করে এক-একবার জোর ইলেকট্রিকের আলো ঝলসে ওঠে! কিসের আলো? তাও বলছি। আমার এক বন্ধু আছে—

বিজ্ঞানে রিসার্চ করার। তাকে একদিন এসে দেখালাম। আলো জ্বালা দেখে সে বল্লে, তাঁদের ল্যাবোরেটারিতে ওই-রকম আলো জ্বলে; ওর দ্বারা খুব শক্ত ওষুধ বা আরক তৈরী হয়। দেখুন তো, সন্দেহজনক ব্যাপার নয়? বাড়ীতে কেউ নেই—অথচ রাত্রে ওপরের ঘরে আরক তৈরী হয়?

নকুড়ের কথায় অতিশয় কৌতূহলী এবং উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বললাম—কী করতে হ'বে, বলুন। এখন চট্‌পট্ একটা প্ল্যান ঠিক করা দরকার।

—আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হ'বে। নকুড় বললে—জগদীশের বাড়ী আপনি গেছেন, বাড়ীর ভিতরটা দেখলে নিশ্চয় আপনি চিনতে পারবেন ঠিক বাড়ীতে ঢুকেছি কি না; যার-তার বাড়ীতে তো আর ঢুকে পড়তে পারি নে, ট্রেস্‌পাস কেসে পড়ব যে! তারপর আমার পক্ষে আপনিই যে প্রধানতম সাক্ষী; আপনাকেই তো জগদীশ সেনকে সনাক্ত করতে হ'বে। আমরা দু-জনে মিলে সেই বাড়ী খানাতল্লাস করব।

বললাম—যদি কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহ'লে নিশ্চয় অনেক অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। কবে যাবেন? আমি রাজী আছি।

—কবে কি? আজই সন্ধ্যার পর। এ-সব ব্যাপারে দেরী করলেই শিকার হাতছাড়া হোয়ে যায়। আপনি বাড়ীতে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন; আপনাকে আমি তুলে নিয়ে যাবো।

[illegible]

আমার কাছে থেকে স্বীকারোক্তি নিয়ে আর [illegible] বিষয়ে পরামর্শের পর নকুড় প্রস্থান করলে। অনুবর্তী রাত্রের অকল্পিত অ্যাডভেঞ্চার কল্পনা ক'রে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

কি হবে কে জানে!

নয়

—ওই, ওই যে সামনে ডানদিকে বাড়ীটা, যার সব ঘরগুলো অন্ধকার, জানালা-দরজা সব বন্ধ।—ওই বাড়ীটা! দেখুন দেখি ঠিক নয়?

শীতের সন্ধ্যায় স্বল্পালোকিত পথ ঘাট ধূসর হ'য়ে উঠেছে। শীতল বাতাসে শরীরের ভিতর পর্য্যন্ত শীর্ণ-সঙ্কুচিত বোধ হচ্ছে। রাত্রি অমাবস্যা।

এমনি এক রাত্রে বালিগঞ্জে চিত্রগুপ্ত লেনের মোড়ে দাঁড়িয়ে একটি বাড়ীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম।

নকুড়ের প্রশ্নের উত্তরে বল্লাম—খুব সম্ভব ওই বাড়ী। ঠিক সেই রকম বড় দরজা; সেই তিন ধাপ সিঁড়ি।

সহসা নকুড় আমার জামার হাতায় টান মারলে, বল্লে—ওই দেখুন!

দেখলাম—সেই বাড়ীর উপতলার ঘরে সহসা দপ্‌-দপ্‌ করে অতি তীব্র ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল। নকুড় বললে—দেখছেন! কী অস্বাভাবিক আলো! নিশ্চয়ই ওপরের ঘরে কোন লোক কিছু অদ্ভুত কাজ করছে।

বিস্মিত হয়েছিলাম, তাতে সন্দেহ নেই।

বললাম—কিন্তু, এখন কথা হ'চ্ছে, ও বাড়ী যদি তল্লাস করতে হয়, কেমন করে করবেন? বাড়ীর দরজা তো সব সময় বন্ধই থাকে আর আপনি তো বললেন, চাকরগুলো সহজে দরজা খুলতে চায় না।

নকুড় বললে—সে ব্যবস্থা করছি। কিন্তু বাড়ীর ভিতর ঢুকতে আপনার সাহস আছে তো? যদি সেই শয়তান-রেটার বাড়ী হয়, তাহলে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা আছে!

—বিপদের জন্য ভয় করিনে; কিন্তু যদি অন্য কোন ভদ্রলোকের বাড়ী হয়···

—সেজন্যে আপনার ভাবতে হ'বে না। সে দায়িত্ব আমার। পিস্তলটা ঠিক আছে তো? আচ্ছা, তবে চলে আসুন।

নকুড়ের পিছু পিছু রাস্তা পার হ'য়ে সেই বাড়ীর দরজা'র সুমুখে উপস্থিত হলাম।

বুকের মধ্যে গুর-গুর করতে লাগল।—আশু ভবিষ্যতের অজানা উত্তেজনায় যেমন স্পন্দিত হচ্ছে।

নকুড় আমার কাণে কাণে বললে—যাই দরজা খুলবে, অমনি দুজনে জোর করে ঢুকে পড়ব। রেডি?

আমি ঘাড় নাড়তেই নকুড় দরজার ওপর উঠে গিয়ে সজোরে

কড়া নাড়ল। একবার দুবার, তিনবার। ভিতরে লোক-চলাচলের শব্দ হ'ল, কিন্তু কোন উত্তর এলো না।

নকুড় তখন অবিকল হিন্দুস্থানী সুরে হাঁকলে—বাবুজী। টেলিগ্রাম হ্যায়।

ভিতর থেকে এবার আওয়াজ এলো—কোন্ হ্যায়?

নকুড় বললে—কেয়াড়ি খোল। টেলিগ্রাম।

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

যে দরজা খুলেছিল, দেখে বুঝলাম, লোকটা বাড়ীর কোন চাকর-বাকর হ'বে। আমাদের আচরণে লোকটা যেমন বিস্মিত, তেমনি রাগান্বিত হ'ল। বললে—একি জবরদস্তি আপনাদের। বাড়ীর ভিতর ঢুকেছেন কেন? এ তো বড় অন্যায়। কাকে চাই বলুন না। বাবু নেই। আপনারা যান।

রিভলভারটা তার মুখের কাছে ধ'রে নকুড় বললে—চুপ!

পিস্তল দেখে সে বেচারা কেঁপে উঠল। নকুড় বললে—জগদীশ বাবু কোথায়?

চাকরটা বাঙালী; বললে—জগদীশ বাবু? তিনি কে? তাঁকে তো চিনি না।

নকুড় গর্জ্জন করে উঠল—

—চেন না, মিথ্যাবাদী! আমরা তুজন চোর-ডাকাত নই, আমরা পুলিশের লোক। সত্যি কথা না বললে, এখুনি পিচমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাবো। তুই কে?

—আজ্ঞে, আমি বাবুর চাকর। আমার নাম কুশধ্বজ।

—তোর বাবুর নাম কি ?

—বাবুর নাম শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র গাঙ্গুলি।

বললাম—সেন থেকে একেবারে গাঙ্গুলি! তোর বাবু কোথায় ?

—বাবু পশ্চিম গেছেন বেড়াতে। আমি আর রামদিন বাড়ীতে আছি।

—বাবুর আর কে আছে ?

—বাবুর নিজের কেউ নেই হুজুর। কেবল দু'একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে। আর তাছাড়া বাবুর একটা ছোট ভাইপো না ভাগ্নে আছে। সে অনেক দিন আগে একবার এসেছিল তারপর আর আসে নি।

—কি নাম তার, সুকুমার ?

—আজ্ঞে ; তা জানি না।

নকুড় বললে—বাড়ীতে এখন কেউ নেই যদি, ওপরের ঘরে আলো জ্বলে উঠছে কি ক'রে ?

—আজ্ঞে না।

—আজ্ঞে না! বেটা মিথ্যেবাদী কোথাকার! জানিস, তোর বাবু খুনী আসামী! আমরা তাকে ধরতে এসেছি। যদি গোলমাল করিস, তা'হ'লে তোকে শুদ্ধু—বুঝেছিস ? হ্যাঁ। চুপ কোরে থাক্। আমরা বাড়ীখানা তল্লাস করব।

এই বলে তাকে সাম্‌নে নিয়ে আমার হাত ধরে নকুড় ভিতরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

চারিদিকে চেয়ে দেখছিলাম। হ্যাঁ; অনেক বস্তুই অতিশয় পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে। ঠিক! সেই রহস্য-কুটিতেই এসেছি। কোন সন্দেহ নেই।

নকুড়ের প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নেড়ে বললাম—এই বাড়ী! নো ডাউট।

বৈঠকখানা ঘরের আসবাবপত্র চিনতে বিলম্ব হ'ল না। এই তো সেই চেয়ার, যার উপরে বসেছিলাম। ঠিক সেই। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুদিন পূর্বের সেই ভীষণ রাত্রের ভয়াবহ স্মৃতি মনের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠল।

কিন্তু, তবুও মনে হোলো যেন, স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ঘরটাকে আজ যেন কিছু বড় বলে মনে হোলো, আর হলের ওদিকে ওপরে ওঠবার যে সিঁড়ি রয়েছে সেটা কি ডানদিকেই ছিল, না বাঁ-দিকে? ঠিক করতে পারলাম না।

কিন্তু না, সেই ঘর, সেই সোফা (যার ওপর ললিতা বসেছিল) মেঝের সেই লাল কার্পেট পাতা। হুবহু!

ধীরে ধীরে তিনজনে উপরে উঠতে লাগলাম।

দশ

যে ঘর থেকে আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেই ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নকুড় পকেট থেকে টর্চ্চ বার ক'রে জ্বাললে; তারপর সজোরে বন্ধ দ্বারের উপর পদাঘাত করলে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না। সশব্দে খুলে গেল।

নকুড় বললে—ভিতরে গিয়ে আলো জ্বালো, কুশধ্বজ।

চাকরটী অতিশয় ভীত হ'য়ে পড়েছিল; আদেশ পাবা মাত্রই ভিতরে ঢুকে বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বেলে দিলে। আমরা সাবধানে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে ঘরের মধ্যে পা বাড়ালাম।

প্রশস্ত কক্ষ। আসবাবপত্র কোথাও কিছু নেই। শুধু ঘরের কোণে ছোট একটী টেবিল; তার উপর কয়েকটা ছোট বড় কাঁচের শিশি (তার একটাতে খানিকটা তরল পদার্থ রয়েছে); কিছু দূরে একটা ছোট বাক্স বসানো। দেখে মনে হোলে, সেটা ইলেক্‌ট্রিকের ব্যাটারি।

নকুড় আমার পানে চাইলে। দুজনেই নীরব। ঘরে যে কিছুক্ষণ আগেও লোক ছিল, তাতে আর সন্দেহ রইল না।

নকুড় ইংরাজীতে বললে—কী রকম মনে হয়। ঘরে কেউ ছিল, নয় কি?

বললাম—নিশ্চয়।

দুজনেই কুশধ্বজের দিকে চাইলাম। দেখলাম, লোকটা বোকার মত হাঁ ক'রে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে।

নকুড় বললে—চলুন, যে ঘরে শিল্পীর শিল্প নিদর্শনগুলি আছে, সেই ঘরেই এখন যাওয়া যাক্।

চলুন; বলে অগ্রসর হলাম। চাকরটা আমাদের ঠিক সম্মুখে রইল।

* * * *

নকুড় আমার কাণে কাণে বললে—পিস্তলের টিগার থেকে মুহূর্ত্তের জন্যও আঙুল সরাবেন না। খুব সাবধান।

তারপর কুশধ্বজকে উদ্দেশ করে ব'ললে—এই, তোর বাবুর বয়স কত? কী রকম দেখতে? ঠিক ক'রে বল্, তা না হ'লে—

—আজ্ঞে হুজুর, সত্যি কথাই বলব। বাবুর বয়েস, এই পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর হ'বে। দেখতে খুব ফরসা; তবে বয়েস হয়েছে বলে রংটার তেমন জলুস নেই। মাথার চুল প্রায় সবই সাদা।

বললাম—ঠিক হয়েছে। একই লোক। এই যে, সামনেই দরজা। এই ঘর।

অবশেষে সেই রহস্য-কুঠির সেই আশ্চর্য্য ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। তার ভিতরে জীবন্ত মানুষের মৃত্যু-যন্ত্রণাকে ছবির পর ছবিতে আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত রূপ দান করা হয়েছে। কী ভীষণ-সুন্দর সেই ছবিগুলি! এই ঘরে একদিন

আমিও ক্ষণেকের জন্য এসে বসেছিলাম। সেদিনের সেই মুহূর্তগুলি এ জীবনে ভুলবো না। ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সারা অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠলো।

দরজা ভেজানো ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। নকুড় হাঁকলে—কুশধ্বজ···

কুশধ্বজ ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দিলে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। হতাশ হ'য়ে পড়লাম। একখানিও ছবি ঘরের মধ্যে নেই শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করছে।

বললাম—ছবিগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

নকুড় বললে—এই ঘর বটে তো?

চারিদিক তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ করে সন্দীহান হ'য়ে উঠলাম।

সহসা মনে পড়ল, ঘরের একধারে একখানা ছবির পিছনে একটা গহ্বর দেখতে পেয়েছিলাম; সেইটেই বা গেল কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। কোন ফল হ'ল না।

চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। ঠিক স্থানে এসেছি তো? যে ঘরে সে রাত্রে এসে মৃত্যুর পথ থেকে সৌভাগ্যক্রমে ফিরে গিয়েছিলাম, আজকের এই ঘর কী সেই একই কক্ষ! কে জানে!

আরও ঘণ্টাখানেক ধরে বাড়ীর চারিদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করলাম। সব বৃথা হোলো। সন্দেহজনক কোন কিছুই পাওয়া গেল না।

ভয়ে আতঙ্কে ত্রস্ত-বিবর্ণ চাকরটাকে ধমক দিলাম, জেরা করলাম, কিন্তু সে-বেচারা যা বললে, তার ভিতর থেকে কোন প্রয়োজনীয় কথাই পাওয়া গেল না।

নীচে নেমে সদর দরজার কাছাকাছি এসে নকুড় ইংরাজীতে বললে—যদি ভুল হোয়ে থাকে তাহলে বড় লজ্জার কথা। এ ব্যাটাকে এখন হাত করতে হবে।

এই ব'লে কুশধ্বজের হাতে খানদুই নোট গুঁজে দিয়ে নকুড় বললে—দেখ কুশধ্বজ! তোমার বাবু ফিরে এলে আজকের কোন কথা তাঁকে বলবার দরকার নেই। বুঝেছো? হাঁ। তোমাকে আমরা মনে রাখবো। দরকার পড়লে আমাদের কাছে যেও; সাহায্য পাবে।

কুশধ্বজ প্রথমটা বিস্মিত হ'ল তারপর আভূমি প্রণত হ'য়ে বললে—আজ্ঞে!

ক্ষণেক পরে অত্যন্ত হতাশ মনে আমরা সেই বাড়ী থেকে বিফল মনোরথ হোয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

* * * *

"ভারত আশ্রমে" ফিরে এসে যে বিস্ময় লাভ করলা[ম] তাতে ভয়ে ভাবনায় মন যেন বিহ্বল হয়ে গেল!

অজিতা যেসে নেই! অথচ এ সময় তার কোথাও যাবা[র] কথা নয়। আমরা উভয়ে স্থির করেছিলাম, যতদিন না এ-রহস্যে[র] সমাধান হয়, ততদিন অজিতা একলা কোথাও বেরুবে না। কিন্তু সে নেই। কোথায় গেল?

তাহলে সে কি আমায় পরিত্যাগ করে চলে গেল ? অসম্ভব ! সে-কথা কল্পনাও করা যায় না।

চাকরটাকে জিজ্ঞাসা ক'রে যে-সংবাদ পেলাম, তাতে আমার আশঙ্কা আরো বেড়ে উঠল। শুনলাম, একজন বুদ্ধ-গোঁছের ভদ্রলোকের সঙ্গে ললিতা বেরিয়ে গেছে !

বুদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক ! তাহলে কি জগদীশ ! জগদীশ এসে কি ভাইঝিকে ধ'রে নিয়ে গেছে !

সারা দিন স্নানাহার ভুলে সহরের চতুর্দ্দিকে তার খোঁজ করলাম, কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পেলাম না।

হতাশায়, অবসাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে পড়ল।

'ভারত-আশ্রমের' নীচের তলায় অবিনাশ নামে একটি পাটের দালাল থাকতো ; লোকটি যেমন ভদ্র তেমনি অমায়িক। তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।

সন্ধ্যার সময় অবিনাশ আমার ঘরে এসে বসল। এ-কথা সে-কথার পর বললে—বিজয় বাবুকে আজ যেন কিছু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

বললাম—হ্যাঁ, অবিনাশ বাবু। একটা ব্যাপারে ভারী চিন্তায় আছি।

কিয়ৎকাল নীরব থেকে অবিনাশ বললে—আপনার স্ত্রী বাপের বাড়ী গেছেন বুঝি ?

হঠাৎ তার কথায় অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলাম। অবিনাশ কেন, মেসের প্রায় সকলেই জানে যে ললিতা আমার স্ত্রী !

আমতা আমতা ক'রে বললাম—হ্যাঁ, যাবে এই কয়েক দিনের জন্যে…

কী যে বলব, ভেবে না পেয়ে চুপ করতে বাধ্য হলাম।

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে—তাই তাঁকে আজ সকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখলাম।

চমকে উঠে বললাম—শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখলেন! আজ সকালে?

অবিনাশ আমার চমক লক্ষ্য না ক'রে বললে—হ্যাঁ, আজ সকালেই তো; আমি ঐ সময়ে এক বন্ধুকে তুলে দিতে ষ্টেশনে গিছলাম। বন্ধুটিও চিটাগাং মেলে যাচ্ছিল। প্ল্যাটফর্মে আপনার স্ত্রীকে দেখি।

বললাম—সঙ্গে আর কে আছে?

অবিনাশ আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—সঙ্গে তাঁর কাকা আছেন। তাঁদের কথাবার্ত্তা খানিকটা শুনতে পেয়েছিলাম। তাতেই বুঝেছিলাম, তিনি আপনার খুড়শ্বশুর।

ব্যস্ত ব্যগ্র কণ্ঠে বললাম—কি কথাবার্ত্তা শুনলেন?

অবিনাশ বললে—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন আপনি জানেন না যে তিনি চলে যাচ্ছেন…

তার অসমাপ্ত কথার মাঝেই বলে উঠলাম—আপনি ঠিক বলেছেন। আমাকে না জানিয়ে ললিতা চলে গেছে। কি কথাবার্ত্তা আপনি শুনলেন, দয়া করে বলুন।

অবিনাশ ক্ষণেক নীরব থেকে বললে—আপনার স্ত্রীর কথা শুনে মনে হ'ল যেন তাঁর যাবার ইচ্ছে নেই, যেন জোর ক'রে

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এক সময় তিনি বললেন—চট্টগ্রাম! এত দূর যেতে হবে? না, আমি এতদূরে যাব না।

রুদ্ধশ্বাসে বললাম—তার পর?

অবিনাশ বললে—আপনার খুড়শ্বশুর তাঁকে ভয় দেখাতে লাগলেন। তখন তিনি আর কোন কথা বললেন না। সব কথা তো শুনতে পাই নি। দু-চারটে যা কানে এসেছিল, তাই আপনাকে বললাম।

সর্ব্বনাশ!

জগদীশ ললিতাকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে একেবারে চট্টগ্রাম পালিয়েছে! সেখানে মেয়েটার ভাগ্যে কী শোচনীয় পরিণাম অপেক্ষা করছে, কে জানে!

আফ্‌শোষে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করতে লাগল। কেন ললিতা গেল? কেন সে আপত্তি করলে না?

পরক্ষণেই মনে হল, সে নারী, একাকিনী, নিরুপায়! তার উপর, কোন কারণে জগদীশ তাকে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে, ললিতা কোন কাজে আপত্তি করলেই, জগদীশ, তাকে ভয় দেখায়, তখন ললিতার সব আপত্তি ভেসে যায়।

অবিনাশ বললে—আর-একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখলাম, বিজয় বাবু?

বিস্ফারিত চোখে বললাম—কি জিনিষ?

—আপনার খুড়-শ্বশুরের সঙ্গে একজন চীনাম্যান রয়েছে। তিনজনে এক কামরায় উঠলেন।

—চীনাম্যান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ; বেশ লম্বা-চওড়া, জমকালো পোষাক-পরা। মনে হল, তার সঙ্গে আপনার খুড়-শ্বশুরের খুব ভাব।

আরো দুচার কথার পর অবিনাশ নিজের কাজে চলে গেল। বিহ্বল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে চিন্তার অকূল সমুদ্রে ডুবে গেলাম।

কোথা থেকে এ কী হ'ল! জগদীশ ললিতাকে নিয়ে চাটগাঁ পালিয়ে গেল। সঙ্গে এক চীনাম্যান!

সারা রাত চোখের পাতা নামলো না।

রাত জেগে মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প আঁটলাম, ললিতাকে উদ্ধার করতেই হবে এবং জগদীশকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে অনেকবার অনেক পৈশাচিক কার্য্য ক'রে রেহাই পেলেও এবার আমার হাতে তার পরিত্রাণ নেই। আমি যে কাপুরুষ নই, তাও তার কাছে প্রমাণ করতে হবে।

পরদিন যথাসময়ে চিটাগং মেলের একখানা প্রথম শ্রেণীর কাম্‌রায় উঠে বসলাম। শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো উত্তেজনায় যেন কঠিন হয়ে উঠেছে।

ট্রেন চলতে লাগল।

তখন কল্পনাও করতে পারি নি যে এই যাত্রার শেষে আমার জন্য কী বিচিত্র রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী অপেক্ষা করছে।

এগারো

চট্টগ্রামে আমার একজন পরিচিত সি আই ডি অফিসার ছিল। নাম কিঙ্কর হালদার। অনেক দিনের পুরানো লোক। নিজের কাজে হাত পাকিয়েছে।

সোজাসুজি তার বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। পরম সমাদরে কিঙ্কর আমায় অভ্যর্থনা করলে।

—ব্যাপার কি। তুমি হঠাৎ এ মগের মুলুকে?

বললাম—কখন্ কে যে কোথায় আসে তা কি আগে থাকতে জানা যায় বন্ধু।

—তা তো বটেই। যাই হোক, বেড়াতে, না কোন কাজে?

বললাম—কাজে। বিশেষ কাজে। সে-কাজে তোমার সাহায্য আমার একান্ত দরকার।

ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে কিঙ্কর বললে—আমার সাহায্য!

—হ্যাঁ, তোমার সাহায্য। তোমার শরণ নিলাম। আশা করি, বিমুখ করবে না।

কিঙ্কর আমার দুহাত ধরে বললে—ও কি কথা তুমি বলছ, বিজয়। তোমায় কোন সাহায্য করতে পারলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করব। বল দেখি, কি ব্যাপার

তখন ধীরে ধীরে তার কাছে আগাগোড়া সমস্ত কাহিনী বিবৃত করলাম, একটি কথাও বাদ না দিয়ে।

কিঙ্কর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রৈল। তারপর বললে—অদ্ভুত কাহিনী। যাই হোক, আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না, এবং ভাগ্য যদি একটুও ভাল হয়, দু'তিন দিনের মধ্যেই তোমার জিনিষ তোমার হাতে অর্পণ করতে পারব।

এই ব'লে কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করে সে বললে—একটা মূল্যবান সূত্র পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে এই যে, জগদীশ একজন চীনাম্যানের সঙ্গে এখানে এসেছে। এখানে দু' একটা চীনে আড্ডা আছে; অত্যন্ত সাংঘাতিক সে দল। তারা করে না এমন কাজ নেই। অথচ পুলিশ তাদের এখনো উচ্ছেদ করতে পারছে না। আমার মনে হয়, প্রথমে আমাদের ওই দিকেই সন্ধান করতে হবে।

* * * *

পরদিন সকাল।

কিঙ্কর আমাকে নিয়ে সহর দর্শনে বেরিয়েছিল। ইতিমধ্যে সে চারিদিকে ললিতার সন্ধানে গুপ্তচর লাগিয়েছে। একজন প্রৌঢ় বাঙালী ও তার সঙ্গে একটি বাঙালী মেয়ে—কোন চীনে আড্ডায় এদের দেখা পেলেই গুপ্তচরেরা তাকে খবর দেবে, এই ছিল আদেশ। ষ্টেশনে ও ষ্টীমার ঘাটেও গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়েছিল।

চৌমাথার কাছে এসে কিঙ্কর বললে—বিজয়, আমি একবার হেড্‌কোয়ার্টারে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। তুমি বাসায় যাও। পথ চিনতে পারবে তো?

হেসে বললাম—তা বোধ হয় পারবো! ওই তো সামনের রাস্তার শেষে।

কিঙ্কর বললে—হ্যাঁ, রাস্তার শেষে বাঁ দিকের গলি। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরবো। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

ঘাড় নেড়ে অগ্রসর হলাম। কিঙ্কর থানার দিকে প্রস্থান করলে।

কয়েক পা যেঁষে চলে গেল—এমন ব্যস্ত ভাবে ও এত তাড়াতাড়ি গেল যে তার সঙ্গে আমার রীতিমতো ধাক্কা লাগলো …চমকে উঠে মুখ তুলে দেখলাম, লোকটা কয়েক হাত দূরে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আমায় দেখছে।

কাছাকাছি হ'তেই লোকটা ঘাড় নুইয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বললে—মাপ করবেন, মশায়।

লোকটা চট্টগ্রামী মুসলমান। পোষাক-পরিচ্ছদ নিতান্ত অভদ্র নয়। হেসে বললাম—না, না, তাতে আর কি! পথ চলতে গেলে অমন হয়ই।

লোকটা তখন অন্য ফুটপাতে চ'লে গেল। আরও কয়েক পা এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি, লোকটা ফুট দিয়ে ধীরে চলেছে এবং মাঝে মাঝে আমাকে দেখছে।

আশ্চর্য্য হলাম। যে-লোক ক্ষণকাল পূর্ব্বে অতখানি ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি হাঁটছিল, এখন হঠাৎ তার গতি এমন ধারা শিথিল হ'ল কি কারণে? ব্যাপার ঠিক বুঝলাম না।

কিঙ্করের বাসায় ফিরতেই ঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলে—

[ঠা]কুরজী, আজ কি রান্না হবে? বাবু বলছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা [কর]তে।

বলমাম—আমায়? আচ্ছা, তাহলে মাংসের কালিয়া রাঁধো [আ]র মাছের ঘণ্ট।

রাঁধুনী ঘাড় নেড়ে চলে গেল। আমি স্নানের আয়োজন [ক]রতে লাগলাম।

ক্রমে একঘণ্টা, দুঘণ্টা অতিবাহিত হ'ল, কিঙ্করের আসবার [না]ম নেই।

ঠাকুর বললে, বাবুর এমন-ধারা বিলম্ব হওয়া নতুন নয়, [সু]তরাং চিন্তার কোন কারণ নেই। তার অনুরোধে আমি [আ]হার ক'রে নিলাম।

অপরাহ্ন-কালে একজন হিন্দুস্থানী বেহারা এসে আমার নাম [ধ]'রে ডাকাডাকি করতেই দরজা খুলে বললাম—তুমি কে হে; [কো]থাথেকে আসচো?

বেহারাটা আমার পানে তাকিয়ে বললে—হুজুরের নাম কি [বি]জয় বাবু?

—হ্যাঁ, ভাই। কিন্তু তুমি আমায় ডাকছো কেন?

—চিঠি আছে, হুজুর।

এই ব'লে-সে তার জামার পকেট থেকে একখানা পত্র বার ক'রে আমার হাতে দিলে।

কিরাম্বতে চিঠিখানা খুলে দেখলাম, তার ভিতর ইংরাজীতে লেখা আছে।

"বিজয়,

পত্র পাঠ মাত্র এই লোকের সঙ্গে সঙ্গে এসো। সন্ধান পাওয়া গেছে।

কিঙ্কর"

আর কোন কথা লেখা নেই। কিন্তু কি সন্ধান পাওয়া গেছে তা বুঝতে আমার বিলম্ব হ'ল না।

বেহারাটাকে প্রশ্ন করলাম—বাবু কোথায় রে?

—আজ্ঞে, তিনি বাজারের ধারে একটি বাড়ীতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—তুমি কি সেই বাড়ীর চাকর?

বেহারা বললে—আজ্ঞে না, আমি থানায় কাজ করি। বাবুর সঙ্গে সেই বাড়ীতে গিছলাম।

—সেখানে আর কে আছে?

—দু'জন পুলিশের বাবু আছেন।

তখন আর কোন রকম সন্দেহ বা কালবিলম্ব না ক'রে তার সঙ্গে পথে বেরুলাম। দরজার সামনে একখানা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল; বেহারা বললে—অনেকখানি পথ, হেঁটে যাওয়া অসুবিধে; তাই গাড়ী এনেছি। উঠুন।

গাড়ীতে উঠতেই কোচমান ছিপটি মেরে ঘোড়াটাকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় করালে।

পথঘাট কিছুই চিনি না। দেখলাম, চওড়া রাস্তা ছেড়ে গাড়ী ক্রমে একটি সরু গলির মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল।

এদিকটার কোঠা-বাড়ী বিশেষ নেই; টিনের ছাউনি করা ছোট ছোট ঘর—কতকটা বস্তির মত।

বললাম—আর কতদূর?

—আজ্ঞে না। আর দূর নয়। এসে পড়েছি।

গাড়ী থামলো। পথে নামলাম। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বেহারাটা সামনের একটা মাঠকোটার মত বাড়ী দেখিয়ে জানালে যে এই বাড়ীতে কিঙ্কর আমার জন্ম অপেক্ষা করছে।

দরজা খোলাই ছিল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। দরজার পিছনে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে।

বেহারা বললে—ওপরে আছেন। আমার পিছনে পিছনে আসুন।

কিন্তু আমাকে আর বেশী দূর অগ্রসর হ'তে হ'ল না। সহসা অন্ধকারের ভিতর থেকে অতর্কিতে তিন চার জন লোক আমার উপর লাফিয়ে প'ড়ে আমাকে নিমেষের মধ্যে ভূতলশায়ী করলে। কোন রকম চীৎকার বা প্রতিবাদ করবার আগেই আততায়ীদের মধ্যে একজন আমার মুখের উপর একটা বিকট গন্ধযুক্ত রুমাল চেপে ধরলে। মিনিট খানেক মাত্র···তারপরেই আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম।

* * *

চোখ মেলে চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সকাল হয়েছে; উন্মুক্ত জানলার ভিতর দিয়ে প্রভাত-সূর্য্যের আলো মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে।···

কিন্তু আমি কোথায় ?

এ তো কিঙ্করের বাসা নয় ! ধীরে ধীরে গত সন্ধ্যার কথা মনে প'ড়ে গেল। ঘরটার চারিদিকে আর-একবার তাকিয়ে বুঝলাম, আমি বন্দী হয়েছি।

দুর্ব্বৃত্তরা কৌশল ক'রে কিঙ্করের নামে আমাকে ভুলিয়ে এনেছে। কিন্তু কেন ? এরা তো আমায় চেনে না ! তবে কি এখানেও আমি পুনরায় জগদীশের কবলে পড়লাম ?

মনে মনে এই সকল চিন্তা করছি এমন সময় দরজার বাইরে ঝনাৎ ক'রে শব্দ হ'ল ; তারপরেই দরজা খুলে গেল এবং একজন বিশালকায় ব্যক্তি দরজা খুলে ধরল ও অপর একজন খানসামা-গোছের লোক একটা কাঠের বড় রেকাবে চা রুটি কলা প্রভৃতি নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

বিস্মিত নয়নে চেয়ে দেখলাম, দুজনেই চীনাম্যান। দরজার কাছে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রইল তার যেমন বিরাট দেহ তেমনি কুৎসিত মুখ। হাতে তার একখানা প্রকাণ্ড ধারাল ছুরি।

চায়ের রেকাবখানা মেঝের উপর বসিয়ে রেখে দ্বিতীয় লোকটা চলে গেল। ছুরি-হাতে চীনেটা কিন্তু নড়ল না, যেমন নির্ব্বিকার মুখে ছিল তেমনি ভাবে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রৈল। বুঝলাম, তাকে আমার পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছে।

দারুণ ক্ষুধা বোধ করছিলাম। সারা রাত কিছুই খাওয়া হয় নি ; সেই যা কাল দুপুরে ভাত মাংস-তরকারী খেয়েছি। সুতরাং ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সম্মুখে কতকগুলো আহার্য্য বসানো রয়েছে ; সেগুলি ভোজনীয় সন্দেহ নেই ; কিন্তু খেতে সাহস হয় না

কিছুক্ষণ পরে দ্বাররক্ষী চীনাটা ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো ; আঙুল দিয়ে চায়ের পাত্রটা দেখিয়ে অর্দ্ধেক ইংরাজী অর্দ্ধেক চীনে ভাষায় কতকগুলো কথা বললে ; তার মর্ম্ম হচ্ছে এই :—তুমি খাচ্ছনা কেন ?

মুখ তুলে তার পানে চেয়ে বললাম—এর মধ্যে বিষ আছে।

আমার কথা শুনে চীনাটা খক্ খক্ শব্দে প্রচণ্ড ভাবে হেসে উঠল ; তারপর সজোরে মাথা নেড়ে বললে—না, না, বিষ নেই। তুমি খাও।

বললাম—ঠিক ?

এবার চীনাটা হঠাৎ রেগে উঠল ; চোখ মুখ পাকিয়ে বললে —আমি মিথ্যেবাদী ?

—না, না, সে কি কথা। তা বলি নি। এই ব'লে চীনেটাকে শান্ত করে চায়ের পাত্রটা টেনে নিলাম। ভাবলাম, এরা যদি আমাকে মারতেই চায় তাহলে তো যে-কোন মুহূর্ত্তে আমায় শেষ ক'রে ফেলতে পারে ; তার জন্যে চায়ের মধ্যে বিষ মেশাবার তো প্রয়োজন নেই ! এদিকে ক্ষুধার জ্বালায় দু'চোখে অন্ধকার দেখছি। সুতরাং···

আঃ ! কী আরাম ! জীবনে এই প্রথম চায়ের স্বাদ পেলাম।

চীনেটা বললে—আর রুটি চাই ?

—চাই।

—চা? আর খাবে?

—নিশ্চয়।

চা, রুটি ও কলা আহার ক'রে মনে হল যেন প্রাণ ফিরে পেলাম।

চীনেটাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ফল হল না, আমার দিকে চেয়ে মুখ ভেংচে সে দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল।

ধীরে ধীরে আবার মনের মধ্যে অবসাদ ঘনিয়ে আসতে লাগল। বিষণ্ণ অন্তরে ঘরের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কিসের জন্য আমায় বন্দী করা হয়েছে, তার কোন অর্থ নির্ণয় করতে পারছি না।

ঘরটির একদিকে দরজা, অপরদিকে একটি ছোট জানলা, জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ি খুলে দেখলাম, পিছনে মোটা লোহার গরাদ, তাদের নড়াতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। বুঝলাম, আমার ঘরটি দোতালায়; নীচে, বাড়ীর ভিতরকার উঠান। উঠানটির একদিকে দরজা, অন্য কোন প্রবেশ-পথ নেই। এখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে গলা চিরে ফেললেও আমার গলার স্বর বাইরে যাবে না—সুতরাং সে চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, বরং তাতে উৎপীড়িত হবার সম্ভাবনা।

বারো

ধীরে ধীরে সূর্য্যের তেজ ক'মে আসতে লাগল। পৃথিবীর বুকে আর একটি রাত্রি আসন্ন প্রায়।

হতাশায় আমার দেহমন যেন ভেঙে পড়েছে। অপরিচিত স্থানে বিদেশে এসে শেষে এমন অবস্থায় পড়লাম যেখান থেকে আর বোধ হয় জীবন্ত ফিরে যেতে হবে না।

ক্রমে সন্ধ্যা নাম্‌লো। আমার ঘর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। দ্বিতলে কোন আলো জ্বলছে না, কিন্তু একতালা থেকে আলোর রেশ উপরে ভেসে আসছে। এবং মনে হল যেন নীচেকার উঠানে একাধিক লোকের কলগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

জান্‌লার খড়খড়ি তুল্‌লাম।

আশ্চর্য্য ব্যাপার!

নীচের উঠানের সে নিঃসঙ্গ মলিন মূর্ত্তি আর নেই। সমস্ত উঠান জুড়ে রঙীন গাল্‌চে পাতা হয়েছে, থামে থামে ফুলের মালা আর চীনে লণ্ঠন ঝুলছে, চতুর্দ্দিকে একপ্রকার পাৎলা ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে—বোধ হয় সুগন্ধি ধুপ-ধুনা জেলে দেওয়া হয়েছে। গালচের উপর একধারে সুদৃশ্য মখ্‌মলের শয্যা, দুধারে তাকিয়া; সামনে একটা প্রকাণ্ড গড়গড়া।

গালচের উপর ব'সে আছে তিন চারজন চীনাম্যান ও জনদুই চট্টগ্রামী মগ। মাঝে মাঝে তারা লম্বা হুঁকায় টান দিচ্ছে তারপর ঘাড় মুখ নেড়ে গল্প করছে। তাদের ভাব দেখে মনে

হয় যেন তারা কোন পদস্থ ব্যক্তির জন্যে অপেক্ষা করছে—হয়ত সে ব্যক্তি তাদের দলপতি।

কয়েক মিনিট পরে দূরে কোথায় ঢং ঢং ক'রে পাঁচবার ঘণ্টা বাজলো। ঘরের মধ্যে যারা বসেছিল তারা উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে চেয়ে দেখলাম, সোনালী রং-করা এক বিচিত্র পোষাক পরা একজন দীর্ঘাকৃতি চীনাম্যানের সঙ্গে জগদীশ সেন ঘরে ঢুকলো ?

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম।

জগদীশের পরণে পাৎলুন, মাথায় লম্বা ফেজ, মুখে এক বিরাট চুরুট।

সকলে মাথা নুইয়ে দুজনকে সেলাম করলে। বুঝলাম, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ভূষিত চীনাম্যান এদের নেতা।

দলপতি জগদীশকে নিয়ে মখমলের আসনের উপর বস্‌ল। নেপথ্য থেকে ঠুং ঠুং শব্দে বাজনা বেজে উঠল।

দরজা দিয়ে আরো চীনা আসছে—ক্রমে ঘরটি পূর্ণ হয়ে গেল।…

সকলের পিছনে এলো কয়েকজন বাহক ; তাদের কাঁধে এক-একখানি প্রকাণ্ড ছবি।

ছবিগুলি তারা অদূরে সভাপতির সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে দিলে। ছবিগুলিকে আমি দেখতে পেলাম এবং দেখে বিস্ময়ে উচ্চকিত হয়ে উঠলাম।

সেগুলি জগদীশের অঙ্কিত মৃত্যু-যন্ত্রণাকাতর নর-নারীর ছবি যেগুলি আমি তার বাড়ীতে দেখেছিলাম।

সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল—আমার ছবিখানাও যে রয়েছে⋯ ওই যে!

ছবিগুলি দেখে চীনাগুলা মহা কলরব সুরু করে দিলে; এক একখানা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে এক একদল চীনা কিচির মিচির করতে লাগল।

হঠাৎ হাততালির শব্দ হতেই ঘর স্তব্ধ নীরব হ'য়ে গেল। দেখলাম, দলপতি ও জগদীশ উঠে দাঁড়িয়েছে।

দলপতি হাত নেড়ে কি বলতেই চীনাগুলো এক মুহূর্ত্তে নীরব হ'য়ে গেল, তারপর নিজ নিজ স্থানে গিয়ে বসল।

জগদীশ তখন যেখানে ছবিগুলো সার-বন্দী দাঁড় করানো ছিল সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গম্ভীর দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বলতে লাগল।

আমি না বুঝতে পারলেও চীনাগুলো তার প্রত্যেকটি কথা বুঝে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল; জগদীশ যখন আমার ছবিখানার দিকে আঙ্গুল বাড়ালে তখন চীনাগুলো কলস্বরে কি বলতে উঠতেই দলপতি পুনরায় হাত নেড়ে তাদের স্তব্ধ ক'রে দিলে। দেখলাম, একজন চীনা কোমর থেকে একখানা প্রকাণ্ড ধারালো ছুরি বার ক'রে কি ইঙ্গিত করলে; তার ভঙ্গী দেখে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শিউরে উঠল।

জগদীশের বক্তৃতা থামল; তারপর দলপতি হাততালি দিতেই এক ব্যক্তি উঠে বাইরে চলে গেল। জগদীশ সভাপতির পাশে এসে বসল।

ক্ষণকাল পরেই এক সুসজ্জিতা রমণী ঘরে ঢুকে দলপতিকে

কুর্ণিশ করলে। তারপর অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে ধীরে ধীরে নাচ শুরু করে দিলে। আমি অভিভূতের মতো নাচ দেখতে লাগলাম।

দু'তিনজন চাকর ইতিমধ্যে এসে সকলকে পানীয় পরিবেশন করে গেল। তারপর চলতে লাগল ধূমপান। কিছুক্ষণের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ধোঁয়া উঠল এবং সকলে পরম আরামে চণ্ডু টানতে লাগল—জগদীশও বাদ গেল না।

নাচতে নাচতে মেয়েটি সহসা উপর দিকে চাইতেই তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'য়ে গেল। নর্ত্তকী প্রথমে আমাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তারপর কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে বারবার আমায় দেখতে লাগল।......

ঘরের সকলেই তখন নেশায় বুঁদ হ'য়ে গেছে। স্বয়ং দলপতি কাৎ হ'য়ে গেছে। জগদীশের ঘাড় ঝুলে পড়েছে। তাদের দিকে বারেক দৃষ্টিপাত ক'রে রমণী জানলার নীচে এসে আমায় অভিবাদন করলে, আমিও তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিলাম। তখন মেয়েটি আবার তার নৃত্য আরম্ভ করলে।

ঘরের মধ্যে সবাই তখন অচেতন। দর্শক মাত্র একজন, অর্থাৎ আমি; সেই একজন দর্শককেই দেখাবার জন্য তরুণী তার সমস্ত শক্তি উজাড় ক'রে নাচতে লাগল। অপূর্ব্ব সে নৃত্য! বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যায় না।

কিছুক্ষণ পরে ধরাশায়ী দলপতি অস্ফুটে বিড় বিড় ক'রে কি বলতেই রমণী আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কক্ষ পরিত্যাগ করলে, ঘরের আলো নিবে গেল।

আমি তখন জানালার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের কোণে বসলাম। এক অদ্ভুত দৃশ্য এই মাত্র প্রত্যক্ষ করলাম; কিন্তু যার জন্যে এতদূর এসে এ-ভাবে বন্দী হলাম সেই ললিতা কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। ললিতা কোথায় গেল?

* * *

ঘণ্টাখানেক পরে সকালবেলাকার চীনা-প্রহরী ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌লো। তার হাতে একটা তীব্র লণ্ঠন। আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—সন্ধ্যার সময় যে মেয়েলোকটা নাচছিল তাকে তুমি ডেকেছো?

আকাশ থেকে পড়লাম! এ আবার কি কথা। বললাম—কৈ, না।

রক্ষী বললে—সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। বিহ্বল হ'য়ে গেলাম। কি বলব ভাবছি, এমন সময় প্রহরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার সেই নর্ত্তকী লীলায়িত পদক্ষেপে ঘর ঢুকে পরিষ্কার উর্দ্দুতে বললে—সেলাম, বাবু সাব।

মুখ দিয়ে বেরুলো—সেলাম!

রমণী হাসিমুখে আমার কাছে এসে ঘাড় দুলিয়ে বললে—তাজ্জব লাগছে, না?

বললাম—তা লাগছে!

মেয়েটি আমার পাশে বসল।

ভয়ে ভয়ে বললাম—দরজার কাছে লোক রয়েছে ও কিছু বলবে না তোমায় ?

মৃদু হেসে তরুণী জবাব দিলে—ও আমার খুব বশ।

মনে মনে একটা সংকল্প এঁটে সহজভাবে বললাম—তোমার নাম কি ?

—আমার নাম মিঞাজান। তোমার ?

—আমার নাম বিজয়।

—বি—জ—য় ! টেনে টেনে কথাটি উচ্চারণ ক'রে তরুণী বললে—তুমি বাঙালী তো ?

ঘাড় নাড়লাম। মেয়েটি বললে—বাঙালীদের আমার খুব ভাল লাগে।

বললাম—তুমি কোন্ দেশের লোক ?

তরুণী জবাব দিলে—আমি মালয় দ্বীপের লোক। আমার বাবা চীনে আর মা মালয়ের মেয়ে। এখানে এসেছি এক বছর।

—তুমি সুন্দর নাচতে পারো ! বললাম।

এমন সময় প্রহরীটা ঘরে ঢুকে তার কানে কানে কি বলতেই মিঞাজান আমায় বললে—ওরা সব জেগেছে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। কাল আসবো। কাল এ-বাড়ীতে কেউ থাকবে না রাত দশটায় আসবো তোমার কাছে। কেমন ?

ঘাড় নেড়ে বললাম—এসো ; তোমার জন্মে অপেক্ষা করব।

খুসীমুখে মিঞাজান প্রস্থান করলে। আমি তখন উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরে কেমন ক'রে কাল এখান থেকে পালাতে পারি তারই উপায় চিন্তা করতে লাগলাম।

পরদিন যথাসময়ে মিঞাজান আমার ঘরে প্রবেশ করল। নির্জ্জন জনশূন্য বাড়ীটা অন্ধকারে থম্‌থম্‌ করছে ; মিঞাজানের পিছনে প্রহরীটার হাতে একটা লণ্ঠন শুধু জ্বলছিল।

বিশালকায় রক্ষীটাকে দেখে মন দমে গেল। মিঞাজানের হাত থেকে না হয় উদ্ধার পেলাম, কিন্তু প্রহরীটার হাত এড়াবো কেমন ক'রে ?

তরুণী ঘরে ঢুকে প্রসন্ন হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে আমার পাশে বসল। রক্ষী দাঁড়াল দরজার কাছে।

মিঞাজান বললে—তোমাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ওপর আমার মন পড়েছে। তোমার সঙ্গে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করব। কি বল ? তুমি কথা বলছ না কেন ?

ঈষৎ নীরব থেকে বললাম—সামনে যদি সব সময় পাহারা খাড়া থাকে তাহলে প্রাণ খুলে কেমন ক'রে তোমার সঙ্গে কথা বলি, বলতো ?

আমার কথা শুনে মেয়েটি ক্ষণকাল কি ভাবলে, একবার আমার মুখের দিকে দেখলে, তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে প্রহরীটাকে কি বলতেই সে ধীরে ধীরে নীচে গেল।

তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর মিঞাজান ঘরে ঢুকে বললে—এইবার হয়েছে তো !

এই বলে সে একেবারে আমার কোলের উপর এসে বসল।…

আর বিলম্ব নয়।…সেই সুযোগের সুবিধা নিয়ে সেদিন রাত্রে

যে-কাণ্ড করেছিলাম, আজ তা ভাবলেও লজ্জা পাই।···কিন্তু তখন তা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না······

মেয়েটি আমার গায়ের উপর পড়তেই আমি তাকে দুহাতে ধ'রে তার মুখ চেপে ধরলাম। আগের রাত্রে কাপড় ছিঁড়ে ঠিক করে রেখেছিলাম, সেই কাপড় দিলাম তার মুখে গুঁজে তারপর তারই ওড়ান খানা খুলে নিয়ে তাকে বাঁধলাম।···

আমার এই একান্ত অপ্রত্যাশিত আচরণে মেয়েটি এমনই বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিল যে আমাকে বাধা দেবার কোন শক্তিই তার ছিল না।

তার হাতপা বেঁধে তাকে মেঝেতে শোয়ালাম; তারপর একে একে ক্ষিপ্রহস্তে তার পোষাক খুলে নিয়ে নিজে পরলাম। মিনিট দুইতিনের মধ্যেই তার ঘাগরা, পিরাণ ও চাদর আমার গায়ে উঠল; তারপর আমার বস্ত্রগুলি তার গায়ে জড়িয়ে দিলাম। তার অসহায় করুণ অবস্থা দেখে মনের মধ্যে দারুণ অনুশোচনা অনুভব করছিলাম।

চাদরটাকে মাথায় গায়ে জড়িয়ে সন্তর্পণে দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম, বাইরে কেউ কোথাও আছে কি না।

কেউ নেই। অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন।

ফিরে এসে তার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললাম— আমার আজকের আচরণের জন্যে তুমি আমায় মাপ কোরো, মিঞাজান। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই আমাকে এই জঘন্য কাজ করতে হল।

এই ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলাম।

অপরিচিত বাড়ী। প্রতি পদক্ষেপে ভয় করছিল; এখুনি হয়ত শত্রুর হাতের মধ্যে গিয়ে পড়ব।

সামনে সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নীচে নামলাম। দূরে একটা ঘর থেকে আলোর রেখা বেরুচ্ছে। সুতরাং ওদিকে নয়। ভিন্ন পথ ধরলাম।

একটা ছোট্ট বারান্দা পার হয়ে যে-স্থানে এসে পড়লাম, সেটা বাড়ীর পিছন দিক। সামনেই নীচু পাঁচিল। জয় ভগবান্‌ এক লাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওধারে নামলাম। পিছন থেকে কে যেন কি বলে উঠল; কিন্তু তখন আর সেদিকে কান দেয় কে? সামনেই বড় রাস্তা; প্রাণপণে দৌড়তে লাগলাম।

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা তেমাথার মোড়ে এসে পড়লাম। লোকজনের যথেষ্ট ভীড়। দোকান-পাট অনেকগুলো তখনো খোলা রয়েছে।

কয়েক পা গিয়েছি, এমন সময় পিছন থেকে একজন পাহারাওলা হাঁকলে—সবুর!

থেমে দাঁড়ালাম। পাহারাওলা কাছে এসে টর্চের আলো ফেলে বললে—এত রাত্রে কোথায় চলেছো বিবিজান?

বললাম—আমি বিবিজান নই। ভদ্রলোক। অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলাম। আমার থানায় নিয়ে চলো।

এই ব'লে মাথার ঘোমটা খুলে ফেললাম। পাহারাওলা আমার এই অদ্ভুত রূপান্তর দেখে কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে আমার পানে তাকিয়ে রৈল।

সেদিন অনেক রাত্রে কিঙ্করের বাসায় পৌঁছলাম।

হঠাৎ আমাকে নিরুদ্দেশ হ'তে দেখে কিঙ্কর যারপরনাই ব্যস্ত বিব্রত ও উৎকুণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিল, আমাকে দেখে আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

আমার মুখ থেকে একে একে সমস্ত কথা শুনে কিঙ্কর বললে—আমারই—একটু ভুল হয়েছিল। তোমাকে বারণ ক'রে দেওয়া উচিৎ ছিল, যাতে এ-রকম প্রতারণার জালে আবদ্ধ না হও। এ বড় ভীষণ জায়গা। তাছাড়া তুমি যে এখানে এসেছো তা তোমার শত্রুপক্ষ ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে; সুতরাং খুব সাবধান।

বললাম—জগদীশকে দেখলাম, কিন্তু ললিতাকে দেখতে পেলাম না কেন?

কিঙ্কর বললে—তাঁকে হয়ত অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে। যাই হোক, একজন ইনফর্মার লাগিয়েছি। সে কাল খবর দেবে বলেছে।

তের

পরদিন।

ঘুম থেকে উঠে নীচে নেমে দেখলাম, কিঙ্কর একজন গুপ্তচরের সঙ্গে কথা কইছে। আমায় দেখে ঘাড় নেড়ে বসতে ইঙ্গিত করলে।

কিঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে গুপ্তচর বললে—বাঙালীর মেয়ে সে আড্ডায় আছে কি না তা ঠিক দেখি নি তবে লোকটাকে দেখেছি।

কথায় কথায় জানলাম, আর একটা চীনে আড্ডার সন্ধান পাওয়া গেছে; সেখানে জগদীশ যাতায়াত করে।

কিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে—এ মুসাফিরখানা কোথায়? কোন্ রাস্তায়?

ইন্‌ফর্মার একটা রাস্তার নাম করলে।

—তাহলে তো বেশীদূর নয়। মালিকের নাম কি?

—চাংলু।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ইনফর্মার প্রস্থান করলে; তারপর এলো নিকটস্থ ফাঁড়ীর ইন্‌স্পেক্টার রঘুনাথ চৌবে। কাল রাত্রে মুক্তিলাভ করবার পর থানায় এরই সঙ্গে প্রথম দেখা হয় এবং এই লোকটাই আমায় কিঙ্করের বাসায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে। কিঙ্করের সঙ্গে তার অনেকদিনের জানাশুনা।

ঘরে ঢুকে আমায় নমস্কার জানিয়ে রঘুনাথ বললে—শরীর ভাল আছে বাবুজী?

বললাম—হ্যাঁ, তার কোন বৈলক্ষণ্য নেই, তবে যে জন্যে আপনাদের দেশে এলাম তা এখনো সফল হ'ল না।

—হবে, হবে ; কিঙ্কর বাবু যখন আছেন, তখন ভাবনা নেই। —এই ব'লে রঘুনাথ কিঙ্করের দিকে ফিরে বললে—সকাল বেলাই তলব করেছেন কেন, হালদার সাহেব ?

কিঙ্কর বললে—একটি বিশেষ কাজের জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। বলি, শুনুন।

এই ব'লে ধীরে ধীরে কিঙ্কর আমার কথা এবং বিশেষ ক'রে আমার এখানে আগমনের হেতু ইন্‌স্পেক্টারের কাছে বিবৃত করলে।

কিঙ্করের বক্তব্য শেষ হ'লে ক্ষণেক নীরব থেকে রঘুনাথ বললে—আমায় কি করতে হবে বলুন, আমি যথাসাধ্য তা পালন করব।

কিঙ্কর বললে—এইমাত্র একটা মুসাফিরখানার সন্ধান পেলাম ; শুনলাম, সেখানে জগদীশের গতিবিধি আছে। আমরা সেই মুসাফিরখানায় হানা দিতে চাই।

রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলে—এ হোটেল কোথায় আর এর মালিকই বা কে ?

কিঙ্কর বললে। শুনে রঘুনাথ ব'লে উঠল—বড় সাংঘাতিক জায়গা মশায়। যাবেন যান, কিন্তু খুব সাবধান। শুনেছি সেখানে এক দুর্দ্ধর্ষ চীনে-দস্যুর আস্তানা আছে।

অনেক আলোচনার পর স্থির হ'ল, আমি আর কিঙ্কর

হোটেলের ভিতর ঢুকবো, ইন্‌স্পেক্টার চৌবে কাছাকাছি পথের ধারে অপেক্ষা করবে, আমাদের সঙ্কেত পেলেই ভিতরে ঢুকবে।

* * * *

সন্ধ্যার পর।

আমরা দুজনে ধীর পদে চাংলুর হোটেলে প্রবেশ করলাম। আমার অঙ্গে ছিল ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গী রেলগাড়ীর ড্রাইভারের পোষাক কিঙ্কর সেজেছিল হিন্দুস্থানী খাচনদার। নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করে উভয়ে হোটেলের ভিতরে ঢুকে কোনে গিয়ে বসলাম।

চারিদিকে ছোট বড় টেবিল। অনেক লোক ব'সে পানাহার করছে। কিন্তু এর মধ্যে কোথায় সেই চণ্ডূর আড্ডা যেখানে জগদীশ এবং হয়ত ললিতার দেখা পাওয়া যাবে?

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে অস্ফুটে কিঙ্করকে বললাম—কৈ, হে! আড্ডা কোথায়?

—চুপ! সে হচ্ছে আরও ভিতরে, কোন গুপ্ত স্থানে। সেইটেই তো খুজে বার করতে হবে। ব্যস্ত হোয়ো না।

আমাদের সামনে একজন ভদ্রগোছের মুসলমান বসেছিল, খানিক পরে সে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। উঠে গেল বটে কিন্তু বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল না, হোটেলের মালিক যেখানে বসেছিল সেইখানে গিয়ে তাকে কি যেন ব'লে তার পিছন দিকে ঝোলা-পরদার আড়ালে চলে গেল। আমরা আড়চোখে তার এই গতিবিধি নিরীক্ষণ করলাম।

কয়েক মিনিট পরে আর এক ব্যক্তি ঠিক সেই ভাবে পরদার আড়ালে অদৃশ্য হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আরও একজন।

আমাদের সন্দেহ বাড়তে লাগল। কিঙ্কর আমার পা টিপে ইশারা করতেই দাম চুকিয়ে দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম।

কিঙ্কর বললে—ওই পরদার আড়ালে যে ঘর আছে, সে ঘর আমাদের দেখতেই হবে। সেইখানেই হয়ত চণ্ডুর আড্ডা।

এই বাড়ীর পিছন দিকে একটা সরু গলি আছে; চল, দেখা যাক, তার ভিতর দিয়ে ঢোকা যায় কিনা।

দুজনে একটা নোংরা গলির মধ্যে ঢুকলাম, কাছেই বোধ হয় কোন জানোয়ার ম'রে গিয়ে প'চে প'ড়ে আছে; তার বিকট গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিলাম।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই কিঙ্কর বললে—এই তো হোটেলের খিড়কি দরজা···

তার কথা শেষ হবার আগেই খিড়কি দরজার পিছন দিকে খট্ খট্ শব্দ উঠল। কিঙ্কর ক্ষিপ্র অস্ফুট কণ্ঠে আমায় বললে—অন্ধকারে দেওয়াল ঘেসে দাঁড়াও······

কথার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে দেওয়ালের এক কোনে অন্ধকারে দেহ আবৃত ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দেখলাম, ধীরে ধীরে হোটেলের খিড়কি দরজাটা খুলে গেল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই দরজার বিপরীত দিকে গলির ওধারে যে অধিবাসী-বিহীন কাঠের বাড়ীটা ছিল তারও সদর দরজা উন্মুক্ত হ'ল; এবং নিমেষ মধ্যে হোটেল থেকে একজন লোক বেরিয়ে পথ অতিক্রম ক'রে সেই কাঠের বাড়ীতে ঢুকে গেল।

চকিতের মধ্যে দুই বাড়ীর দরজাই বন্ধ হয়ে গেল—যেন কলে কাজ হল।

কিঙ্কর বললে—দেখলে কি চমৎকার ব্যবস্থা। হোটেলের মালিক ব'সে ব'সে কল টিপলে আর দু'বাড়ীর দরজা খুলে আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। বুঝলাম, এই কাঠের বাড়ীর মধ্যেই আসল আড্ডা।

বললাম—এখন কি করা যাবে?

কিঙ্কর বললে—এই কাঠের বাড়ীতে উঠতে হবে ছাদ বেয়ে।

মুখে বলা এক; কাজে করা আর এক। ছাদে ওঠা সহজ নয়। কাঠের বাড়ীটা তিনতালা। এমন কোন জানালা-দরজা বা পথ নেই যার সাহায্যে উপরে উঠতে বা ভিতরে ঢুকতে পারি। পরামর্শের জন্য ইনসপেক্টার রঘুনাথের কাছে যাওয়া হল।

রঘুনাথ এ অঞ্চলের প্রত্যেক বাড়ীর সম্বন্ধেই খুঁটিনাটি খবর রাখে। আমাদের কথা শুনে বললে—কাঠের বাড়ীতে ঢুকেছে? ও বাড়ীতে তো লোক থাকে না! খুঁজে খুঁজে ওরা আড্ডা জুটিয়েছে ভাল।

কিঙ্কর বললে—ওই বাড়ীর ছাদে ওঠা যায় কেমন ক'রে?

চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললে—সহজ নয়। তবে একটা উপায় আছে!

—বলুন, কি উপায়।

রঘুনাথ বললে—ওই বাড়ীটার পিছন দিকে আর-একটা খালি বাড়ী আছে। তার ভিতর ঢুকে…

—আর বলতে হবে না। নিয়ে চলুন আমাদের। এই বলে কিঙ্কর আমায় নিয়ে রঘুনাথের অনুসরণ করল।

অন্ত একটা গলির মধ্যে ঢুকে কয়েক পদ অগ্রসর হ'য়ে একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রঘুনাথ বললে—এই বাড়ী। এর পিছনেই কাঠের বাড়ী। এ-বাড়ীতে লোক নেই। আপনারা অবাধে প্রবেশ করতে পারেন। দরজায় তালা বন্ধ। তাহোক, পাশের পাঁচিল খুব নীচু আছে। উঠতে অসুবিধে হবে না।

কিঙ্কর বললে—ইন্‌সপেকটার, আপনি নীচে থাকুন, দরকার হলেই বাঁশী বাজাব। এস, বিজয়।

নীচু প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে বাড়ীটার ভিতরে ঢুকলাম। চতুর্দ্দিকে নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। গা ছমছম করতে লাগল।

কিঙ্কর বললে—টর্চ্চ এনেছো?

—এনেছি।

—জ্বালো।

টর্চ্চের আলোয় সাবধানে কিঙ্করের পিছনে পিছনে এগুতে লাগলাম।

তার নির্দ্দেশমত জুতা খুলে ফেলেছিলাম—ক্ষণে ক্ষণে পায়ে কাঁটা ফুটছিল, কিন্তু উপায় নেই।

এ-বাড়ীর ছাদের সঙ্গে কাঠের বাড়ীর ছাদ প্রায় লাগোয়া। পার হয়ে যেতে কোন কষ্ট হ'ল না।

কাঠের বাড়ীর ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছি এমন সময় মনে হল, অদূরে চিলে-কোঠার পাশ থেকে একটা লোক সাঁ ক'রে সরে গেল!

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল! কিঙ্করকে বললাম।

কিঙ্কর বললে—ও তোমার চোখের ভুল।

চুপ ক'রে গেলাম। চোখের ভুল? হবেও বা।

ছাদের মধ্যখানে বারান্দা। বারান্দার রেলিং-এর ধারে গিয়ে নীচের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করলাম।

এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য নজরে পড়ল।

নীচে উঠানের উপর বহু লোক জমায়েত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই কার্পেটের উপর শুয়ে প'ড়ে চোঙা নলের সাহায্যে ধূমপান করছে। সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে সব জাতেরই লোক আছে, বাঙালী, মুসলমান, হিন্দুস্থানি, পার্শী, এমন কি সাহেব পর্য্যন্ত।

বল্লাম—জগদীশ রয়েছে; কিন্তু ললিতাকে দেখতে পাচ্ছি না তো?

কিঙ্কর বললে—তাঁকে বোধ হয় অন্য কোন স্থানে আটক করে রেখেছে।

দেখলাম, হঠাৎ জগদীশ ও তার সঙ্গীরা মুখ তুলে ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সরে গেলাম।

কিন্তু তারা বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়েছিল; নীচে প্রচণ্ড চীৎকার উঠল। আলোগুলো এক সঙ্গে নিভে গেল।

কিঙ্কর হঠাৎ তার বাঁশী বার ক'রে ফুঁ দিলে। নীচে সমস্ত শব্দ এক মুহূর্ত্তে থেমে গেল।

আমরা ক্ষিপ্রপদে সে-ছাদ থেকে পাশের বাড়ীর ছাদে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

দু জন কনেষ্টবল নিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার রঘুনাথ চীনে আড্ডায় হানা দিলে। আমাদের বলে গেল—আপনাদের এখানে [illegible] দরকার নেই। বিপদ ঘটতে পারে।

আমরা থানায় এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ রাত্রে খবর এলো, চীনে আড্ডায় অনেকগুলো লোক ধরা পড়েছে; কিন্তু জগদীশের খোঁজ পাওয়া যায় নি; ললিতারও না।

আসল কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

চৌদ্দ

পরের দিন নিরাশা-কাতর চিত্তে কলকাতা পৌছলাম।

আমার জীবন যেন শূন্য হয়ে গেছে। যেন আর কোন কাজ করার নেই: নেই কোন উৎসাহ। ললিতাকে হারিয়ে যেন ভেঙ্গে পড়েছি।

যথাসময়ে কলকাতা ফিরলাম। "ভারত-আশ্রমে" ফিরে এমন বিস্ময় লাভ করলাম, তা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি আনন্দ দায়ক।

আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—ললিতা!

হাঁ করে তার মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম তুমি!

ললিতা মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বললে—এসেছেন!

অনেকক্ষণ তার দুই হাত ধরে দেখলাম। [illegible] একটা [illegible] কথা হ'ল। কলকাতায়, গোয়ালন্দ [illegible] ললিতা [illegible] কাকার কামরা থেকে নেমে পড়ে, তারপর [illegible] একখানা চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ে। একটি ভদ্রলোক তাকে সাহায্য করেছিল। তারই যুক্তে সে নির্বিঘ্নে এখানে ফিরে এসেছে।

উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার পিঠ চাপড়ে বললাম—এই তো চাই! এই না হলে আর……

আমার কথা অসমাপ্ত রয়ে গেল। ললিতা বললে—এই না হ'লে আর কি?

বললাম—এই না হ'লে আর আমার স্ত্রী হওয়া যায়।

মৃদু হেসে ললিতা বললে—যাও।

* * * *

পরদিন।

দিনের বেলাটা যেমন-তেমন ভাবে কেটে গেল। দুপুর বেলা একবার বেরিয়ে নকুড় মিত্রের সঙ্গে দেখা করে এলাম। চট্টগ্রাম-অভিযানের কথা তাকে বিশেষ কিছু বললাম না।

নকুড় অতিমাত্রায় হতাশ হ'য়ে পড়েছে। উপরওয়ালার কাছ থেকে কড়া তাগাদা এসেছে—আর এক সপ্তাহের মধ্যে সে যদি সন্তোষ-জনক রিপোর্ট দাখিল করতে না পারে তাহলে তার হাত থেকে তদন্তের ভার তুলে নেওয়া হবে। তাকে আশ্বাস দিয়ে মেসে ফিরলাম।

সন্ধ্যার পর সকাল-সকাল আহারাদি সেরে নিলাম। বিগত

কয়েক দিনের অপরিসীম উত্তেজনায় ও শ্রান্তিতে দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ; তাই বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম অত্যন্ত পরিমাণে।

ললিতা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প ক'রে পাশের ঘরে শুতে চলে গেল। তাকে ব'লে দিলাম, দরজা জানালা যেন ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে রাখে এবং দরকার হলেই যেন আমাকে ডাকে। চট্টগ্রামের ব্যাপার শুনে সে-বেচারা অতিশয় ভীত হয়ে পড়েছিল।

* * *

বিছানার সঙ্গে দেহের সংযোগ ঘটতেই দু'চোখে ঘুম নেমে এলো। অচির কালের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলাম।

আমার ঘুম সজাগ ও তরল। তাই হঠাৎ কি যেন একটা শব্দ শুনে মধ্য-রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হল।

দু'হাতে চোখ রগড়ে মশারির বাইরে তীব্র দৃষ্টি প্রেরণ করলাম—হঠাৎ ঘুম ভাঙলো কেন? কিসের শব্দে ঘুম ভাঙলো। ঘরে কি কেউ ঢুকেছে?

নিঃশ্বাস, বন্ধ ক'রে রইলাম। মাথার বালিশের তলায় ছিল পিস্তল, সন্তর্পনে সেটাকে বার ক'রে নিলাম। আজ যদি কেউ সম্মুখে প'ড়ে তাহলে তার রক্ষা নেই—দেহমন কঠিন হ'য়ে উঠল!

কিন্তু কোথায় কে? অনর্থক শঙ্কিত হচ্ছি। দরজা জানালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনিই আছে।...

সহজভাবে শুয়ে পুনরায় ঘুমোবার উদ্যোগ করলাম।...এক মিনিট, দু'মিনিট...

তারপরেই আবার খুট খাট শব্দ!... চকিত হ'য়ে উঠে

বললাম। মনে হল যেন, ঘরের প্রান্তে বাগানের ধারে যে-জানলাটা বন্ধ ছিল—তার একটা খড়খড়ি উঠেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ভাল কথা নয়! মশারি তুলে নেমে দাঁড়ালাম! ডান হাতের পিস্তল উদ্যত!

ঘরের মধ্যে আর কোন শব্দ নেই! নিঃশব্দ পদে জানালার ধারে এসে কান পেতে দাঁড়ালাম। বাইরে কিসের যেন শব্দ পাচ্ছি! ক্ষিপ্রহস্তে আলো জেলে দিয়ে চকিতে একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে দেখে নিলাম।

ঘরের মধ্যে কেউ নেই দেখে আশ্বস্ত অন্তরে জানালার কাছে গিয়ে সশব্দে জানালাটা খুলে দিলাম; জানালার বাইরে যদি কেউ থাকে সে আজ মরবে!

জানালার বাইরে কেউ নেই। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, বাগানের প্রান্তে ছায়ার মত এক ব্যক্তি চলে যাচ্ছে।···ক্রমে তার দেহ বাগানের বাইরে মিলিয়ে গেল!

ওই লোকটাই কি দেওয়াল বেয়ে আমার জানালায় উঠেছিল? কেন উঠেছিল?

মনে মনে ভাবলাম, হয়ত আমারই ভুল। ও-লোকটা হয়ত অন্য কাজে বাগানের মধ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু খড়খড়ির শব্দ? তাও হয়ত আমার উত্তেজিত অন্তরের বিকার!

যাই হোক, জানালা বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বাইরে গভীর রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতা! সমস্ত চরাচর সুষুপ্ত! মাঝে মাঝে বহুদূরে বড় রাস্তা দিয়ে দু'একটা মোটর হুস্ হুস্ শব্দে ছুটে চলেছে।

দেখে আর ঘুম আসছে না। কেন জানি না, মনের মধ্যে এক প্রকার অজানা আতঙ্ক অনুভব করছি।…কে যেন ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে…এগিয়ে আসছে।

নাঃ! আজ আর ঘুম হবে না; জেগে জেগে এমন দুঃস্বপ্নও মানুষে দেখে! কোথাও কিছু নেই তবুও মনে হ'ল, কেউ যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকে আমার ভয় দেখে হাসবে!

কিন্তু ওকি ও!…ঘরের মধ্যে শব্দ কিসের?…কান খাড়া ক'রে শুনলাম, খাটের কাছে মেঝের উপর এক প্রকার ক্ষীণ সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে…কেউ যেন চাপা ঠোঁটে শিষ দিচ্ছে।…

আওয়াজ থামলো…আবার সুরু হল।…কিছুক্ষণ পরে মশারি তুলে নীচে নামবার জন্ম পা বাড়ালাম।

নামতে গিয়েই গা শিউরে উঠল…পা একটা নরম জিনিষের ওপর পড়ল…সঙ্গে সঙ্গে চমকে লাফিয়ে উঠে আলোর সুইচটা টিপে দিলাম।…

ফিরে দাঁড়িয়ে যে-দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তাতে ক্ষণকালের জন্ম সর্ব্বশরীর অসাড় হীম হয়ে গেল। দেখলাম হাত তিনেক দূরে একটা কৃষ্ণবর্ণ বিষধর সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে… তার গায়ের উপরেই আমার পা পড়েছিল, পায়ের চাপে সাপটা ক্রুদ্ধ হয়ে ফণা বিস্তার করেছে।…

আর-এক মিনিট এদিক ওদিক হলেই তার ছোবল আমার গায়ে পড়ত!…আলো জ্বালতেই সাপটা লেজে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ছপাৎ ক'রে একবার আমার গায়ের কাছে এসে পড়ল।

আমি একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ করে লাফিয়ে গিয়ে বিছানার উপর উঠে পড়লাম। মশারির একটা কোন্ ছিঁড়ে গেল।

সাপটা অদূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে পিস্তলটা তুলে নিলাম।...সাপটা আবার তার ফণা তুলেছে।...মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং মৃত্যু আমার দিকে তার বজ্র ওঠাচ্ছে।...

প্রথম গুলিটা লাগলো না।...আবার ছুঁড়লাম...এবার লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল না...একটা হিংস্র গর্জন ক'রে সাপটা মাটিতে প'ড়ে তার ল্যাজ আছড়াতে লাগল।...সুযোগ বুঝে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার গুলি করলাম মাথা লক্ষ্য ক'রে।

এবার তার সমস্ত চাঞ্চল্য নিমেষে থেমে গেল।

বাইরে দরজায় শব্দ হচ্ছে। পাশের ঘরে ললিতার গলাও শুনতে পাচ্ছি: দরজা খুলুন! দরজা খুলুন!

—বিজয় বাবু! বিজয় বাবু!

মেসের ম্যানেজার হাঁকছে।...ধীরে ধীরে দরজা খুলে দিলাম। ব্যাপার দেখে সকলে হতভম্ব হ'য়ে গেল!

ললিতা ভয়ে কাঁটা হ'য়ে ঘরের এক কোনে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রৈল। সাপটাকে সৎকার করবার পর উভয়ে একত্রে জেগে ব'সে সে-রাত অতিবাহিত করলাম।

* * * *

পরদিন ভোর হোতে না হোতেই নকুড় মিত্র আমার কাছে এসে হাজির। হতাশ কণ্ঠে বললে—না, বিজয়বাবু কেসটা রাখতে পারলাম না। হাত থেকে বেরিয়ে গেল।

নিরুৎসাহসূচক কণ্ঠে বললাম—গেল নাকি?

—তা বই আর কি! হরেন ঘোষ হাতে নিচ্ছে। সাহেবের কাছে বলেছে—এমন চুপচাপ থাকলে চলবে না, জগদীশকে না পাওয়া যায় তার ভাইঝিকে খুঁজে বার করতে হ'বে। তার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, আর-এক কাণ্ড হোয়েছে।

—কী কাণ্ড? কৌতূহলী হলাম।

—করুণা গাঙ্গুলি বলে একটী মেয়েকে আজ ১৫।২০ দিন হ'ল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার বাবা পুলিশে রিপোর্ট কোরেছে। খবর পাওয়া গেছে, এই মেয়েটী জগদীশের বাড়ীতে যাতায়াত করত, জগদীশের ভাইঝির সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। এই খবর পেয়ে হরেন ঘোষ তো লাফিয়ে উঠেছে; তিন চারজন ইন্‌ফরমার লাগিয়েছে জগদীশের ভাইঝিকে খুঁজে বার করবার জন্যে। তাই বল্‌ছি, কেসটা এত কোরেও রাখতে পারলাম না।

শঙ্কিত ত্রস্ত হ'য়ে উঠলাম। বেচারী ললিতা! সে ঘুণাক্ষরেও জানে না যে, ভিতরে ভিতরে এত ব্যাপার ঘটেছে। সে হয়ত যখন নিঃশঙ্কচিত্তে ঘরে ব'সে গৃহস্থালীর কাজ করছে, তখন পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করবে। বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, কারো কাছে কণামাত্র সাহায্য পাবে এমন একজন কেউ নেই···সেই দারুণ বিপদের মধ্যে একাকিনী বালিকার অবস্থা কল্পনা করে তার প্রতি সহানুভূতিতে অন্তর আপ্লুত হোয়ে উঠল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন কোরেই হোক ললিতাকে এই সকল বিপদের স্পর্শ থেকে রক্ষা করব।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর নকুড় প্রস্থান করলে, আমিও পথে বেরিয়ে পড়লাম।

সহসা কী মনে ক'রে ট্রামে উঠে বসলাম এবং সোজা বালিগঞ্জ অভিমুখে রওনা হলাম। কেমন কোরে, কী যে করব, কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। একবার এ কথাও মনে করলাম, লালবাজারে গিয়ে প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ হরেন ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করি, আবার ভাবলাম, তার চেয়ে আজকের মধ্যেই ললিতাকে কলকাতার বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিই। কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না।

* * *

ভাবতে ভাবতে বালিগঞ্জের চিত্রগুপ্তের লেনে সেই রমেশ বাবুর বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, সদর দরজা খোলা; সম্মুখেই কুশধ্বজ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সে প্রথমটা অতিমাত্রায় ভীত হোয়ে পড়ল, পরে আমার আশ্বাস-বাক্য শুনে কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হ'ল।

বললাম—আমায় দেখে ভয় কি রে! এদিকে এসেছিলাম, তাই একবার তোর বাবুর আর তোর খোঁজ নিয়ে গেলাম। খবর সব ভালো তো? রমেশবাবু ফিরেছেন?

আমার কথায় কুশধ্বজ আপ্যায়িত হয়ে বললে—আজ্ঞে না, এখনো ফেরেন নি, তবে ফিরবেন বোধ হয় শীগগির।

—কেমন কোরে জানলি? চিঠি এসেছে বুঝি!

কুশধ্বজ বল্লে—আজ্ঞে না। তবে ব'লে গিয়েছিলেন কি না, একমাস বাদে ফিরব, একমাস তো হোয়ে এলো, তাই বলছি।

—আচ্ছা কুশধ্বজ, এই একমাসের মধ্যে বাবু তোকে একখানাও চিঠি লেখেনি ?

—আজ্ঞে না ; আমরা চাকর-বাকর বৈত নয়। আমাদের আর কি করতে চিঠি লিখবেন। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দেন। খালি সে-দিন টাকার সঙ্গে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন রামদীনকে ; টাকাগুলি ওঁর ভাগ্নে যাদের কাছে থাকে, তাদের দিয়ে আসতে হয়।

—তাই নাকি ! ভাগ্নে কোথায় থাকে ?

—আজ্ঞে ! আমি তা জানি না। রামদীন জানে।

—ডাক রামদীনকে।

রামদীন এল।

বললাম—রামদীন, তোমার বাবুর ভাগ্নে যেখানে থাকে, আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার ? আমার ভারী দরকার। তোমায় অমনি কষ্ট দেব না। এই নাও।

দশ টাকার নোটখানা হাতের মধ্যে পেয়ে রামদীন-এর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। নাগরা জুতাটা পায়ে গলিয়ে বললে—চলিয়ে।

আধ ঘণ্টা পথ চলার পর রামদীন যে প্রকাণ্ড বাড়ীটার সামনে আমাকে এনে হাজির কোরে বললে—এই মো[illegible]।

চেয়ে দেখলাম, সে হচ্ছে একটা অনাথ-আশ্রম।

রামদীনকে বললাম—আচ্ছা, এবার তুমি যাও—হাঁ, আর দেখ, তোমার বাবু ফিরে এলে, এ কথা তাঁকে বলার দরকার নেই, বুঝেছো।

বহুৎ আচ্ছা—বলে রামদীন সেলাম করে প্রস্থান করলে।

ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ কোরে বললাম—আমি একবার সুকুমারের সঙ্গে দেখা করতে চাই—সুকুমার রায়, জগদীশ সেনের ভাগ্‌নে।

ম্যানেজার আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—জগদীশ সেনের ভাগ্‌নে সুকুমার? কিন্তু সে রকম ছেলে তো এখানে কেউ নেই। সুকুমার নামে একজন আছে বটে, কিন্তু সে হোল রমেশ গাঙ্গুলির ভাগ্নে।

—সেই, সেই। তাকেই চাই।

—কিন্তু আপনি কে, কী বৃত্তান্ত, এ সব না জানলে তো সুকুমারকে ডাকা হবে না। রমেশ বাবুর নিষেধ আছে।

সন্দেহ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

বললাম···আমি পুলিশের লোক। আমি একটা হত্যা-কাণ্ডের তদন্ত করছি এবং সুকুমারের মামা ওরফে জগদীশ সেন সেই ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। ব্যাপার গুরুতর, সুকুমারকে আমি একবার দেখতে চাই। তারপর যদি দরকার হয় তাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। যদি স্বেচ্ছায় রাজী না হন, তাহলে বোধ হয় পুলিশ ডাকতে হ'বে।

আমার কথা শুনে লোকটী অত্যন্ত বিস্মিত এবং ভীত হ'য়ে পড়ল, বললে—না মশায় ও-সব হাঙ্গামায় কাজ নেই। আমি আন্‌ছি! কী ভয়ানক; খুনী আসামী! কি ভয়ানক! বল্‌তে বল্‌তে তিনি ভিতরের দিকে প্রস্থান করলেন।

এবং অনতিকাল পরেই একটী বালকের হাত ধরে পুনরায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

লাফিয়ে উঠে বললাম—সুকুমার! সুকুমার, আমায় চিন্‌তে পার!

সুকুমার হাঁ কোরে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল, বললে—না তো।

—চিন্‌তে পারছো না। সেই যে, অনেক দিন আগে, একদিন রাত্তির বেলা খুব বৃষ্টি পড়ছিল, আর তুমি ট্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে, এমন সময় আমি এলাম, এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে গেলাম—মনে পড়ছে না?

আমার কথা শেষ না হোতেই সুকুমার বললে—মনে পড়েছে! সেদিন অন্ধকার ছিল কিনা, তাই আপনাকে চিন্‌তে পারিনি। আপনি কী মামার কাছে এসেছেন! মামা এখানে থাকেন না। এখানে শুধু আমি থাকি। দিদিও থাকে না। কেউ না।

বললাম—সুকুমার, আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায়?

—তোমার দিদির কাছে? তারপর সবাই বেশ অনেক দূর বেড়িয়ে আসবো। যাবে?

সুকুমার আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল; বললে—হ্যাঁ, যাবো। কী মজা! এখানে এরা আমায় একটুও বেড়াতে দায় না। আমি যাবো।

ম্যানেজারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সুকুমারকে নিয়ে বার হলাম।

তার আনন্দ আর ধরে না। অনর্গল যা মনে এল তাই বকে যেতে লাগল।

বললাম—আগে তোমার মামার বাড়ী যাই চলো, তারপর সেখান থেকে মামার মোটরকারে কোরে বেড়াতে বেরুবো।

সুকুমারে ব্যস্ততার সীমা নেই, বললে—শিগগীর চলুন।

একখানা রিকস্ নিয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই চিত্র-গুপ্তের লেনে রমেশ গাঙ্গুলির বাড়ীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম। রিক্স থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, সুকুমার বললে—কাদের বাড়ী যাচ্ছেন! আমাদের বাড়ী?

বললাম—হ্যাঁ' তাই তো যাচ্ছি।

—ধোৎ! এ বুঝি মামার বাড়ী! এ অন্য লোকের বাড়ী। আমাদের বাড়ী তো ঐ গলির ভিতর। চিনতে পারছেন না বুঝি, আসুন আমার সঙ্গে!

স্তব্ধ হ'য়ে বালকের হাত ধরে এগিয়ে গেলাম। দু-পা গিয়েই যে-পথটী চিত্রগুপ্তের লেনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমদিকে চ'লে গেছে তার উপর দিয়ে বাঁ দিকে কয়েক পা গিয়ে পুনরায় বাঁ-দিকে একটী পথে প্রবেশ করলাম, অর্থাৎ রমেশবাবুর বাড়ীর ঠিক পিছন দিকে যে রাস্তাটি উত্তর থেকে পূব দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তায় প্রবেশ করলাম।

তারপর দু-একখানি বাড়ী পার হ'য়ে যে-বাড়ীখানির সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলাম, সে-বাড়ীখানি রামেশ বাবুর বাড়ীর ঠিক পিছন দিকে।

সুকুমার বললে—এই তো আমাদের বাড়ী!

বললাম—এইবার চিনতে পেরেছি!

কী? আশ্চর্য্য! এতদিন ধরে কি ভুলই করছিলাম! এই তো সেই রহস্য-কুঠী, যার ভিতর এসে একদিন প্রবেশ করেছিলাম। এতদিনে কি সব রহস্যের সমাধান হবে? কে জানে!

ঠিক, সেই সুগঠিত নূতন বাড়ী! এতদিন পরে সফলকাম হ'লাম।

বাড়ীর সুমুখে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখছি, এমন সময় মনে হ'ল যেন উপরের বন্ধ জানালার খড়খড়ি তুলে কে আমাদের দেখছিল, আমি সেইদিকে চাইতেই, খটাস্ করে খড়খড়িটা বন্ধ করে দিলে।

বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা লাগনো। জান্‌লা দরজা সমস্তই বন্ধ।

বল্‌লাম—চলো সুকুমার! এ বাড়ী বন্ধ। কেউ নেই এখানে। আমরা আর-একটা বাড়ীতে গিয়ে বসি।

এই বলে তাকে রমেশ গাঙ্গুলির বাড়ীতে আনলাম। রামদীন বেরিয়ে এসে বল্‌লে—আরে। খোকাবাবু!

বল্‌লাম—রামদীন! একে তোমার কাছে রাখো এখন। আর এই নাও পাঁচটা টাকা; কিছু খাবার-দাবার কিনে এনে খাওয়াও। আর সুকুমারকে খুব ভাল দেখে একটা উড়োজাহাজ কিনে দাও।

বহুৎ আচ্ছা—বলে রামদীন সুকুমারকে ভিতরে নিয়ে গেল।

* * *

বড় রাস্তায় এসে একটা দোকান থেকে নকুড়কে টেলিফোন করলাম। বললাম—কেস্ এখনো আছে। বাড়ী খুঁজে পেয়েছি। হ্যাঁ। সিওর। এখুনি চ'লে আসুন। হরেন ঘোষকে সঙ্গে নেবেন; আর দুজন সেপাই! হ্যাঁ, দুজন! দুজন কন্‌স্‌টেবল্ হলেই চ'লবে। রাইট! হারি আপ্।

সকাল থেকে স্নান নেই, আহার নেই। তার উপর এই অসহ্য উত্তেজনা। দেহ মন ঝাঁ ঝাঁ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সকলে এসে পড়ল। হরেনবাবু এবং ভূপেনবাবু মোটরে বসে রইলেন। আমরা সেপাই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলাম।

দরজায় তালা দেওয়া। নকুড় বললে—দেখবেন মশায়, শেষকালে পরের বাড়ী ঢুকে বিপদে না পড়ি···

বললাম—কোন চিন্তা নাই। ভাঙুন তালা।

নকুড় মোটর ড্রাইভারের কাছ থেকে একটা হাতুড়ি এনে দু'তিন ঘায়ে কড়া ভেঙে ফেললে। তখন সকলে মিলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলাম।

এই তো সেই বাড়ী! ঠিক! সেই বৈঠকখানা ঘর! দ্বিতলে ওঠবার সেই সোপান-শ্রেণী! এবার আর ভুল হয় নি।

উপরে ওঠবার আগে সেপাই দুজনকে নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম। উপর থেকে নীচে নেমে কেউ যেন পালাতে না পারে।

তারপর দুজনে শান্ত পদক্ষেপে দ্বিতলে উঠলাম। সমস্ত বাড়ীময় যেন একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। উপরে

উঠে সামনের ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। আশাআশঙ্কায় বুক আন্দোলিত হ'তে লাগল।

না। এবার আর নিরাশ হলাম না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে নকুড় বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলির দিকে তাকাল। আমি আশা-পূর্ণতার অব্যক্ত আনন্দে এবং অজানা বিপদের আশঙ্কায় বিহ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বুঝলাম, ছবিগুলি নিয়ে জগদীশ ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসেছে।

—ওয়ান্ডারফুল! নকুড় বললে।

বললাম—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। প্রত্যেক ছবিখানিই জীবন্ত মডেল থেকে তৈরী!

সহসা নকুড় বললে—দেখুন, দেখুন।

ওধারে চেয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম। প্রকাণ্ড ইজেল-এর উপর রঙের রেখায় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছিল—আমারই মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর মুখচ্ছবি। সেখানায় শেষ টান দেওয়া হচ্ছিল!

নকুড় বললে—আপনারই ছবি, না?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

পনেরো

আধঘণ্টা ধ'রে সে-ঘর এবং সে ঘরের সংলগ্ন সেই গুপ্তঘর অনুসন্ধান করলাম। করুণার মৃত দেহটি খুঁজে পেলাম না বটে, কিন্তু সন্দেহজনক অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল।

বললাম—চলুন। ওঁদের ডেকে পরামর্শ করি। সবাই মিলে যা ঠিক হয়, তাই করা যাবে।

নকুড় বললে—তাই করাই যুক্তিসঙ্গত। আপনি যান; গিয়ে ওদের ডেকে আনুন; আমি ততক্ষণ এই পায়ের দাগের ছাপটা এঁকে নিই।

আচ্ছা—ব'লে আমি নীচে নামবার জন্য অগ্রসর হলাম। সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় সহসা কে যেন পিছন থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টাল সামলাতে পারলাম না দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে গড়াতে গড়াতে সিঁড়ির নীচে এসে পড়লাম। কনেষ্টবল দুজন সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তারা ছুটে গিয়ে আমার আততায়ীকে ধ'রে ফেল্লে। শব্দ পেয়ে নকুড়ও ছুটে এল।...

যখন কনষ্টেবল দুজন আমার বুকের উপর থেকে তাকে টেনে তুল্লে তখন সভয়ে চেয়ে দেখলাম আমার আততায়ী আর কেউ নয়—স্বয়ং জগদীশ সেন!

কনষ্টেবলদ্বয় সজোরে তার হাত টেনে ধরে রইলো। নকুড় তার পকেট খানাতল্লাস করতে লাগল।

মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে জগদীশ হাঁপাতে লাগল, তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বললে···এতদিনে ধরা পড়লাম। ওই শয়তান-টার জন্তে! ওকে শেষ করতাম—একটুর জন্তে ফস্কে গেল।

এই বলে সে তার দুই জলন্ত ক্রোধোন্মত্ত চক্ষু আমার মুখের ওপর স্থাপন করলে।

নকুড় বেরিয়ে গিয়ে হরেনবাবু এবং ভূপেনবাবুকে ডেকে আন-লে। তাঁদের দেখে জগদীশ শ্লেষ ভরে বলে উঠল—এই যে সবাই এসেছেন! এতদিন সব ছিলে কোথায়? ফুলস্! তোমাদের সাধ্য ছিল না আমায় ধরা! শুধু ওই, ওই শয়তান! ও আমার রহিমকে মেরেছে! আমাকেও শেষ করল।

বললাম—কিন্তু আমি তো আপনার কোন অনিষ্ট করিনি। আপনিই তো আমাকে—

—থাম, থাম। তোমাকে···তোমাকে আমি···একবার যদি ছাড়া পাই। ললিতা কোথায়, ললিতা? আহা বেচারী!

বললাম—তার জন্তে ভাবিত হ'বেন না? সে আমার কাছেই আছে। তাকে আমি বিবাহ করব। সব ঠিক হোয়ে গেছে।

এই কথা শুনে জগদীশ যেন অনেকখানি শান্ত হ'ল, বললে—ঠিক? God bless you? আহা, বেচারী!—বিনা অপ-রাধে অনেক কষ্ট পেয়েছে! তাকে ব'লো' হরিদাসকে সে খুন করে নি; হরিদাসকে খুন করেছিলাম আমি!

—সে কি?

জগদীশ পাগলের মতো হেসে উঠল:

—হাঃ হাঃ হাঃ! হরিদাস আমাকে অপমান কোরেছিল;

ললিতাকে অপমান করেছিল। আমার পিছনে পুলিশ লেলি[illegible] দেবার মতলব করেছিল। অন্ধকারে ললিতা তাকে [illegible] ফুলদান ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তাতে কি [illegible] মরে? সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। শুধু একটি ছুঁচ দিলাম ফুটিয়ে—ব্যস্! তারপর ললিতার অজান্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলাম। অনেক পরে বাড়ী এলাম। বললাম—ব্যাপার কি ললিতা?'···ললিতা তখন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। বললাম—'ঘরে কে'···উত্তর নেই। ঘরে ঢুকে আলো জাললাম? বললাম—'একি!'···ললিতা কাঁপতে লাগলো! বললাম—'করলে কী! খুন করেছো!! এ যে মারা গেছে!'···হাঃ হাঃ হাঃ!

সমস্ত ব্যাপার নিমেষে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। নির্দ্দোষ ললিতা এক অদ্ভুত ঘটনাচক্রের মধ্যে পড়ে নিজেকে অনুক্ষণ অপরাধিনী মনে করে ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল!

হরেনবাবু বললেন—আপনার এই স্বীকারোক্তি লিখে নিলাম। এখন আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হ'বে।

—কেন বলত! আমাকে তোমরা arrest করছ! হুঃ! আমাকে খুনী আসামী ব'লে শাস্তি দেবে! কাগজে কাগজে হুলস্থূল পড়ে যাবে! তোমরা গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে বেড়াবে।··· তার আগে, এই দেখ!

এই ব'লে জগদীশ সহসা ঝুঁকে প'ড়ে তার ডান হাতখানা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে, আঙুলগুলা গালের ওপর বুলুতে লাগল।

প্রথমটা বুঝতে পারলাম না, পরক্ষণেই কনষ্টেবলদ্বয়ের উদ্দেশ্যে চীৎকার কোরে উঠলাম—হাত সরিয়ে নাও! দেখছো না হাতে ছুঁচ রয়েছে—বিষাক্ত ছুঁচ!

কিন্তু ততক্ষণে জগদীশ হাতের ছুঁচ নিজের গালের ওপর ফুটিয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে তার মুখের উপর অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটল, অব্যক্ত যন্ত্রণায় সমস্ত মুখ বিকৃত আকার ধারণ করল; ক্ষণেক নীরব থেকে জগদীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—এই ছুঁচ তোমার জন্যে হাতে কোরেছিলাম। বোধ হয় ভালই হোল যে তুমি বেঁচে গেলে। ললিতাকে আমায় মার্জ্জনা করতে বোলো; আর সুকুমারকে প্রতিপালন কোরো। গুড্ বাই।

তার ঘাড় সম্মুখে ঝুঁকে পড়ল। হাত পা অবশ হোয়ে গেল। পরক্ষণেই সে মেঝের ওপর পড়ে গেল। হরেনবাবু নিকটে গিয়ে তার বুকের ওপর হাত রেখে বললেন—ডেড্!!

* * * *

উক্ত ঘটনার পর তিন মাস অতীত হ'য়ে গেছে। পুলিশ সমস্ত ব্যাপার চেপে গেল। খবরের কাগজে উক্ত ভয়াবহ ঘটনার একটা কথাও প্রকাশিত হ'লো না, এবং লোকে এত বড় একটি ব্যাপারের কোন কথাই জানতে পারলে না। পুলিশ যে ঘটনাটি এভাবে চেপে গেল তার কারণ এই যে, কলকাতার উপকণ্ঠে এমন এক ভীষণ বাড়ী এবং এমন একজন নৃশংস লোক এমন অবলীলাক্রমে পুলিশ-এর হাত এড়িয়ে দিব্য নিরাপদে এতদিন ধরে অবস্থান করছিল, একথা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তা হোলে পুলিশের সুনাম বিশেষ বৃদ্ধি পাবে না।

ললিতাকে আগাগোড়া সমস্ত কথা খুলে বল্লাম। তার পিতৃব্যের স্বীকারোক্তি এবং তার নিকট মার্জ্জনা-ভিক্ষার কথা শুনে ললিতা কাঁদতে লাগল, বললে—আমাকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। কিন্তু কেন যে তাঁর এরকম মতিগতি হোয়েছিল—আশ্চর্য্য !

বললাম—একটা কথা জানতে বড্ড কৌতুহল হচ্ছে ললিতা ?

—বলুন ।

—প্রথম দিন আমি যখন তোমাদের বাড়ী গেলাম, তখন তুমি দুধ খেতে অত আপত্তি করেছিলে কেন ?

—ও, এই কথা ! যেদিন কোন লোককে বা মেয়েকে কাকা ধ'রে নিয়ে আসতেন, সেই দিনই আমায় দুধ খাওয়াতেন। দুধে কি যেন মেশানো থাকতো ; খাবার পরেই আমার ভয়ানক ঘুম আসতো, তারপর সমস্ত রাত জ্ঞান থাকত না ; তাই রাত্রে কী ঘটল, তা কিছুই জানতে পারতাম না। যাতে রাত্রের ব্যাপার কিছু না জানতে পারি, সেজন্যে বোধ হয় কাকা আমায় ওষুধ-মেশানো দুধ খাওয়াতেন।

বললাম—বুঝেছি। থাক্, ওসব কথায় আর কাজ নেই তুমি একটু সুস্থ হোয়ে বিশ্রাম কর। আমি একটু ঘুরে আসি।

*　　　*　　　*

বালিগঞ্জের বাড়ী-দুখানি ভাড়া দেবার জন্য সংস্কার করা হচ্ছিল। সহসা সেদিন সকাল বেলা হেড মিস্ত্রি এসে বললে বাবু, তাজ্জব ব্যাপার···

—কি রে ?

—বাবু, ঐ বাড়ীর দক্ষিণধারে যে বাগান আছে, সেই বাগানের তলায় মাটির নীচে এক মস্ত সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে।

—সে কি!

—আজ্ঞে হাঁ। দেখবেন আসুন।

গিয়ে দেখলাম, সত্যই তাই। প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ। এ-বাড়ীর নীচ থেকে ও-বাড়ীর নীচেকার ঘর পর্যন্ত। এতক্ষণে বুঝলাম, কুলভঙ্গের ছদ্মনামী মনিবের উপরকার ঘরে কী কোরে আলো জ্বলতো। জগদীশ নকুড়ের দৃষ্টি এড়িয়ে এই বাড়ীতে এসে ঢুকতো। তারপর সুড়ঙ্গ দিয়ে ও-বাড়ীতে গিয়ে উপরের ঘরে উঠে আলোক প্রস্তুত করতো। এবাড়ীর চাকর-বাকর কেউই কিছু জানতে পারতো না। কী সুদক্ষ বন্দোবস্ত!

কয়েক মাসের মধ্যেই বাড়ী সুসংস্কৃত হ'য়ে ভাড়া হ'য়ে গেল। দু'জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ভাড়া এলেন। এখন আর দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, ওই বাড়ীর মধ্যেই এত [illegible]ারের ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে।

সমাপ্ত